ইতিহাসপ্রবাহ

অধ্যাপক ডঃ পি.আর. চক্রবর্তী

ষষ্ঠ শ্রেণী



Recommended by West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class VI—vide Notification No. TB./VI/H/79/38 and also Board's letter dated 5.12.79.

ইতিহাসপ্রবাহ

(প্রথম ভাগ)

ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য

পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ

অধ্যাপক ডঃ পি. আর. চক্রবর্তী

এম. এ. (ডবল), বি. টি., পিএইচ, ডি.

অবসরপ্রাপ্ত রীডার, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন। গবেষণা পরিচালনার জন্য ইউ. জি. সি. বৃত্তিপ্রাপ্ত। এম. এ., বি. এড., বি. এ. (অনার্স), মাধ্যমিক ইত্যাদি পরীক্ষার পরীক্ষক। কলিকাতার বালিগঞ্জ গভর্নমেণ্ট হাইস্কুল, কটকের জানকীনাথ বসু মেমোরিয়াল বঙ্গবিদ্যালয় ও শ্রীরামপুরের মাহেশ হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক। 'সরল উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস' (একাদশ-দ্বাদশ), ইতিহাসপ্রবাহ (সপ্তম শ্রেণী), Happy Readers (I and II for VI & VII), 'বাংলা শেখানোর ছিটেফোঁটা' (বি. টি./বি. এড.), 'সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র দত্ত', 'শিক্ষা ও সাহিত্য' ইত্যাদি বহু গ্রন্থপ্রণেতা। বিশিষ্ট শিক্ষামূলক মাসিকপত্রিকার নিয়মিত লেখক।

সংবিৎ

৩৬/২ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

শ্রীমতী অণিমা দেবী কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৭৯
দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুআরি, ১৯৮০
তৃতীয় সংস্করণ : মার্চ, ১৯৮১

প্রচ্ছদ :
বাসব চট্টোপাধ্যায়

ভিতরের ছবি :
বাসব চট্টোপাধ্যায়
রাকা চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর :
লীলা ঘোষ
তাপসী প্রিন্টার্স
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

মূল্য :—৫·০০ টাকা

নিবেদন

আজকের কিশোর-কিশোরীর মানসিক যাত্রাপথ দেশের নাগরিকত্বের গণ্ডী থেকে বিশ্বনাগরিতার সীমাহীন বিস্তার পর্যন্ত প্রসারিত। মানুষের ইতিহাসের প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিত সমগ্র বিশ্ব—এই পরিপ্রেক্ষিতেই আজকের কিশোর-কিশোরীর ইতিহাস পঠন-পাঠন শুরু হওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য ইতিহাসের যে পাঠ্যক্রম ঘোষণা করেছেন, তাতেও এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অভিনন্দনযোগ্য।

কিন্তু একই কারণে এই নবতম পাঠ্যক্রম অনুসারে ইতিহাস লেখার এবং পড়ানোর দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। সারা জীবন শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কাটিয়ে আমার দুটি অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে। প্রথমটি এই যে, ইতিহাসে আগ্রহ সঞ্চারিত না হলে ছোট ছেলেমেয়েরা ইতিহাস পড়তে পছন্দ করে না। দ্বিতীয়টি এই যে, উপযুক্ত শিক্ষণপদ্ধতি অবলম্বন না করায় বহু শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী আন্তরিক পরিশ্রম সত্ত্বেও ছাত্রছাত্রীদের মনে এই 'বহুকল্প-দুর্লভ' আগ্রহটুকু সঞ্চার করতে পারেন না। এই আগ্রহ সঞ্চার এবং সঞ্চারিত আগ্রহের পরিপোষণে পাঠ্যবইয়ের ভূমিকাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেই গুরুত্বের কথা মনে করে এই বইটিকে যথাসাধ্য সহজ করে লেখবার চেষ্টা করেছি—তথ্যপরিবেশন, এমন কি সমালোচনামূলক মন্তব্যের বেলায়ও গল্প বলার ভঙ্গি বজায় রাখবার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। এই দিকটির কথা স্মরণ রেখেই পর্যদ্ চলিতভাষা ব্যবহারের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এর ফলে লেখকের কাজ হৃত্ত হয়েছে ; ছাত্রছাত্রীরাও মোটামুটি তাদের মুখের ভাষায় ইতিহাস পড়তে পেয়ে স্বস্তিলাভ করবে এবং মুখের ভাষাকে মনের ভাষায় রূপান্তরিত করবার প্রশস্ততর সুযোগ পাবে। একই কারণে শিক্ষক-

শিক্ষয়িত্রীদেরও সুবিধা হবে। শিক্ষণসহায়ক উপকরণ, বিশেষ করে মানচিত্র ব্যবহার করলে এই নতুন ইতিহাস পড়ানোর ব্যাপারটা চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠবে। অনুশীলন হিসাবে কিছু কিছু 'হাতের কাজ' করালে ইতিহাসের সঙ্গে আরো বেশী মানসিক সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই প্রতি অধ্যায়ের শেষে দু-একটি 'হাতের কাজে'র পরামর্শ দিয়েছি।

কিন্তু আর পরামর্শ নয়—দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষণপদ্ধতি নিয়ে প্রিয় শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দিতে দিতে বৃদ্ধ বয়সেও সেই অভ্যাস রয়ে গেছে বুঝতে পারছি। অতএব এখানেই সংযত হচ্ছি।

পরিশেষে প্রিয় শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের কাছে একটি আন্তরিক অনুরোধ : এই বইয়ের উন্নতিসাধনে নিঃসঙ্কোচে পরামর্শ দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন। প্রসঙ্গতঃ নিবেদন করছি, তাঁদের সমালোচনাকেও আমি সাহায্যরূপেই বরণ করব।

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন
বীরভূম

বিনীত
গ্রন্থকার

সূচীপত্র

(পর্ষৎনির্দিষ্ট সিলেবাস নিখুঁতভাবে অনুসরণ করেই বইটি লেখা। সূচীপত্রেই সিলেবাস পাওয়া যাবে, তাই পৃথক্ ভাবে সিলেবাস দেওয়া হল না।)

প্রথম অধ্যায়

আমরা ইতিহাস পড়ব কেন?—সুদূর প্রাচীনকালে কী করে পৃথিবীর নানা স্থানে মানবসভ্যতা গড়ে উঠেছিল, কিভাবে সেই সভ্যতা পরিবর্তিত হতে হতে বর্তমান সভ্যতা গড়ে তুলেছে, ইতিহাস সেইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। প্রকৃতির নানা জিনিসকে কিভাবে মানুষ যুগে যুগে কাজে লাগিয়েছে, এক যুগের অভিজ্ঞতার ফলে কিভাবে পরবর্তী যুগে নিজেদের কাজকর্ম এবং জীবনযাপনের প্রণালীকে পরিবর্তিত করেছে, ইতিহাস থেকে সেসব জানা যায়। তাই মানবজাতির অতীত কার্যকলাপ সম্বন্ধে ধারণা পাবার জন্য আমাদের ইতিহাস পড়া দরকার।

আজ পৃথিবীতে চলেছে বিজ্ঞানের যুগ। এই যুগে সভ্য মানুষেরা নানা জাতিতে বিভক্ত হয়ে নানা দেশে উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলেছে। গড়ে তুলেছে বড় বড় শহর, বন্দর। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে খাদ্য, বস্ত্র, বাড়িঘর, যানবাহন, আসবাবপত্র ইত্যাদির প্রচুর উন্নতি হয়েছে। বহু মানুষ সুখে জীবন কাটাচ্ছে। কিন্তু এখনো বহু জায়গায় মানুষ অসভ্য জীবন কাটাচ্ছে—দেখে মনে হয়, আধুনিক কালের সভ্য পৃথিবীর সঙ্গে তাদের বুঝি পরিচয়ই নেই। আবার সভ্যতার সংস্পর্শে এসেও বহু দেশে অধিকাংশ মানুষ অতি দরিদ্রের জীবন কাটাচ্ছে। এরকম পার্থক্য কেন হল, সভ্যতার অগ্রগতি পৃথিবীর সব মানুষকে কেন এখনো সুখী করে তুলতে পারল না, এসব কথা জানতে হলেও প্রাচীন কালের কথা আমাদের জানতে হবে। ইতিহাস হল প্রাচীন কালের কথা। তাই বর্তমান কালকে ভালভাবে বুঝতে হলে আমাদের ইতিহাস পড়া দরকার।

প্রাচীন মানুষ সম্পর্কে কি করে জানা গেল—বর্তমানে কোন্ দেশে কি ঘটছে, সেসব বইপত্রে লেখা থাকছে। ভবিষ্যতে এখনকার ঘটনা জানতে কোনো অসুবিধাই হবে না। কিন্তু চিরকাল তো আর ছাপাখানা ছিল না। পুরানো হাতেলেখা বইপত্রে বড় জোর দু-হাজার

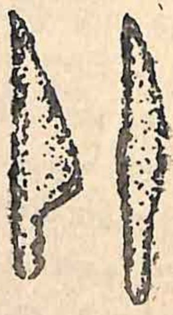
বছরের কথা জানা যায়। কিন্তু তারও আগে মানুষ সভ্যতা গড়ে তুলেছে অন্ততঃ তিন লক্ষ বছর ধরে। সেইসব প্রাচীন মানুষের কথা কিভাবে জানা গেল? জানা মোটেই সহজ হয়নি। ইতিহাসে দু-এক লাইনের মধ্যে যে কথা বলা হয়েছে, সেটি জানতে হয়ত হাজার হাজার মানুষের সাহায্যের দরকার হয়েছে।

পণ্ডিতেরা মানুষের ইতিহাসকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করেছেন। নানা রকমের লেখা বা উপাদান থেকে যে যুগের ইতিহাস প্রায় সঠিক ভাবে জানা যায়, সেই যুগকে বলা হয় 'ঐতিহাসিক যুগ'। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে বলা যায়, অ্যালেকজ্যাণ্ডারের ভারত-আক্রমণ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ঐতিহাসিক যুগ। এর আগের কয়েক শ বছরের কথা কিছু কিছু কাব্য, জনশ্রুতি, কিংবদন্তী, সাহিত্য ইত্যাদি থেকে খানিকটা পাওয়া যায়। যেমন, আমাদের দেশের রামায়ণ ও মহাভারত অথবা গ্রীসের 'ইলিয়াড' এবং 'ওডিসি'। এই যুগকে 'আদি ইতিহাসের যুগ' বলে। কিন্তু তার আগে যে কয়েক লক্ষ বছর ধরে মানুষের যুগ, তার লিখিত কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না। এই সুদীর্ঘ যুগকে বলা হয় 'প্রাগৈতিহাসিক যুগ' (প্রাক্ + ঐতিহাসিক = প্রাগৈতিহাসিক। প্রাক্ = আগের)। এই তিনটি বিভিন্ন যুগের কথা বিভিন্ন রকমের উপাদান অর্থাৎ জিনিস থেকে পাওয়া গেছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা জানবার প্রধান উপাদান হল বিভিন্ন প্রকার হাতিয়ার, মাটির পাত্র, ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ, মানুষের ও



জীবাশ্ম



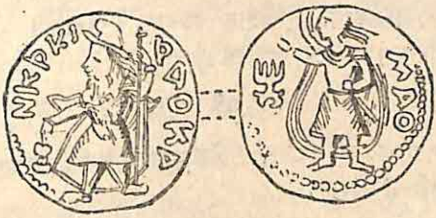
প্রস্তরযুগের ছোরা

অন্যান্য প্রাণীর কঙ্কাল, জীবাশ্ম। অতি প্রাচীনকালে মাটির তলায় বহু জীবজন্তু বা উদ্ভিদ জমে পাথর হয়ে গেছে অথবা পাথরের গায়ে জীবজন্তু বা উদ্ভিদের ছাপ পড়ে গেছে। এগুলিকে জীবাশ্ম বলে। (অশ্ম = পাথর)

আদি ইতিহাসের যুগের প্রধান উপাদান হল প্রাচীন কাব্য বা সাহিত্য, জনশ্রুতি, শিলালিপি, তাম্রপট ইত্যাদি। পাথর খোদাই করে যে লেখা, তাকে বলে শিলালিপি। তামার পাতে খোদাই করে লেখা হলে সেই পাতকে বলা হয় 'তাম্রপট'।

ঐতিহাসিক যুগের উপাদান প্রচুর। এর মধ্যে রয়েছে প্রাচীন কাহিনী, আত্মজীবনী, জীবনী, শিলালিপি, সংবাদমূলক চিঠিপত্র, সরকারী আদেশ ও নির্দেশ, ফরমান, বিচার বা আইন বা শাসন সম্পর্কে লেখা, ব্যবসা-সম্পর্কিত দলিল বা কাগজপত্র ইত্যাদি।

এছাড়াও নানা জিনিস থেকে তিন যুগ সম্পর্কেই জানা যায়। এগুলির মধ্যে রয়েছে ছবি, মূর্তি, বাড়িঘর, ধ্বংসাবশেষ, রাস্তাঘাট,



প্রাচীন মুদ্রা (দু পিঠ)

সেতু, স্তম্ভ, খাল, মুদ্রা, হাতিয়ার, পোশাক, অস্ত্র, কাগজপত্র ইত্যাদি।

ভারতের ইতিহাস রচনায়ও উল্লিখিত সবরকম উপাদানই কাজে লেগেছে। পণ্ডিতেরা এখনো ভারতের নানাস্থানে ইতিহাসের উপাদান খুঁজে চলেছেন।

এক নজরে

(১) মানবজাতির অতীত কার্যকলাপ জানতে হলে ইতিহাস পড়া দরকার। প্রাচীন কাল থেকে ধীরে ধীরে কি করে আজকের সভ্যতা গড়ে উঠেছে, তা বুঝতে গেলে ইতিহাস পড়া দরকার। (২) প্রাচীন কালের ইতিহাস অনেক উপাদান থেকে জানা গেছে: (ক) প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাসের উপাদান হাতিয়ার,

মৃৎপাত্র, জীবাশ্ম, ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি। (খ) আদি ইতিহাস যুগের উপাদান কাব্য, সাহিত্য, শিলালিপি, তাম্রপট ইত্যাদি। (গ) ঐতিহাসিক যুগের প্রধান উপাদান নানাপ্রকার লেখা।

তাছাড়া ধাতু ও শিলালিপি, ছবি, মূর্তি, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, স্তম্ভ, মুদ্রা, হাতিয়ার, পোশাক ইত্যাদি তিন যুগেরই উপাদান।

অনুশীলনী

নিবন্ধধর্মী ও ছোটউত্তরধর্মী

১। ইতিহাস পড়া দরকার কেন ?
২। ইতিহাস রচনার বিভিন্ন উপাদান উল্লেখ কর।
৩। প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগ কাকে বলে ?
৪। আদি ইতিহাসের যুগ কাকে বলে ?
৫। বুঝিয়ে বল :—জীবাশ্ম ; তাম্রপট ; শিলালিপি ; আত্মজীবনী।

নৈর্ব্যক্তিক

কোন্ যুগের ইতিহাস রচনায় নীচের কোন্ উপাদান কাজে লাগে লেখ : সরকারী আদেশ, জীবাশ্ম, মুদ্রা।

২। শুদ্ধ হলে ✓ চিহ্ন, ভুল হলে × চিহ্ন পাশে বসাও :—পাথরে খোদাই করা লেখাকে তাম্রপট বলে। নিজের লেখা নিজের জীবনীকে আত্মজীবনী বলে। জীবাশ্ম প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস রচনার উপাদান। ঐতিহাসিক যুগের চেয়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগ আরো প্রাচীন।

হাতের কাজ

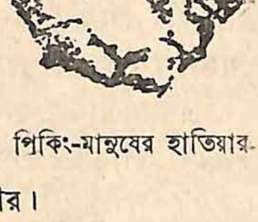
১। ইতিহাসখাতায় জীবাশ্ম ও প্রাচীন মুদ্রা আঁক। নীচে নাম দাও—'প্রাচীন ইতিহাসের কয়েকটি উপাদান'।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদিম যুগের মানুষ

পণ্ডিতেরা হিসাব করে বার করেছেন, অন্ততঃ ২০০ কোটি বছর বা তারও আগে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু মানুষের মত প্রাণী সৃষ্ট হয়েছে বড় জোর ৮।১০ লক্ষ বছর আগে। পণ্ডিতেরা এদের নাম দিয়েছেন আধা-মানুষ। পুরোপুরি মানুষ সৃষ্টি হয়েছে আরও বেশ কয়েক লক্ষ বছর পর।

পিকিং মানুষ—সবচেয়ে পুরানো যে মনুষ্যসমাজের কথা জানা গেছে, পণ্ডিতেরা সেই মানুষের নাম দিয়েছেন পিকিং-মানুষ। এরাও ছিল আধা-মানুষ। এসিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত চীনের রাজধানী পিকিং থেকে ২৭ কিমি. দূরে চাউকাউটিয়েনে ১৯২৬ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে বহু দাঁত এবং প্রায় চল্লিশ জনের মাথার খুলি ও অস্থির জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়। এরই কাছাকাছি পাওয়া যায় গণ্ডার, হায়েনা, ভালুক, হরিণ, মোষ ইত্যাদি প্রাণীর জীবাশ্ম। পিকিং-মানুষের কঙ্কালের সঙ্গে পাথরের তৈরি কাটারি চাঁচুনি ইত্যাদি পাওয়া গেছে। আরো প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, এই মানুষেরা আগুনের ব্যবহার জানত। আগুনের সাহায্যে তারা শীত নিবারণ করত, হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করত এবং খাবার রান্নাও করত। এরা কঠিন পাথর ও হাড়ের হাতিয়ার বানাত। এদের জীবাশ্মের কাছেই এইসব হাতিয়ার, উনুন, শিকার-করা যেসব হরিণ এরা রান্না করে খেয়েছিল সেগুলির পোড়া হাড়গোড় ইত্যাদি পাওয়া গেছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন পিকিং-মানুষেরা প্রায় তিন লক্ষ বছর আগেকার।


পিকিং-মানুষের হাতিয়ার

পিকিং-মানুষেরা দল বেঁধে থাকত, তবে এখনকার মতো সমাজ বেঁধে, ঘরবাড়ি তৈরি করে থাকত না। নিজেদের খাবার যোগাড় করবার কাজেই তারা সারাদিন এখানে ওখানে ঘুরত। চাষবাস জানত না। ফলমূল এবং পশুপাখীর মাংস খেয়েই তাদের পেট ভরাতে হত। খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। ওরা ছিল যাযাবর।

প্রস্তরযুগ ও ধাতুযুগ—খাদ্যসংগ্রহ, গৃহস্থালী বা অন্যান্য প্রয়োজনে মানুষ আদিকাল থেকেই নানা হাতিয়ার ব্যবহার করে এসেছে। ধাতু দিয়ে হাতিয়ার তৈরি শুরু হয়েছে এখন থেকে মোটামুটি ৭/৮ হাজার বছর আগে। তার আগে পাথর দিয়েই বেশীর

ভাগ হাতিয়ার তৈরি হত। পণ্ডিতেরা এই দুই যুগের নাম দিয়েছেন 'ধাতুযুগ' ও প্রস্তরযুগ'। আধা-মানুষের আদিম যুগ থেকে ধাতুযুগের আগে পর্যন্ত বহু লক্ষ বছর দীর্ঘ যুগটি প্রস্তরযুগ। তারপর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মাত্র ৭।৮ হাজার বছর ধাতুযুগ।

পুরানো পাথরের যুগ (প্রত্নপ্রস্তর যুগ)

আদিম মানুষকে খাদ্য সংগ্রহ করতে খুবই বেগ পেতে হত। চারিদিকে অরণ্য, অরণ্যের মধ্যে রয়েছে নানা ফলমূল, নানা খাদ্য। অথচ অরণ্যের মধ্যেই রয়েছে অসংখ্য হিংস্র প্রাণী।

আদিম যুগের মানুষেরা তাই পাথর দিয়ে নানারকম হাতিয়ার বানাত। জন্তুজানোয়ার মেরে তার ছাল ছাড়াবার জন্যে, মাংস টুকরো করবার জন্যে, রাত্রে গুহায় বাস করবার জন্যেও হাতিয়ার দরকার হত। একেবারে গোড়ার দিকে তারা বড় বড় পাথর দিয়েই হাতিয়ার বানাত (ওজন ২/৩ কিলো)। পিকিং-মানুষের যেসব হাতিয়ার পাওয়া গেছে, এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত হাতিয়ারের মধ্যে সেগুলিই সবচেয়ে পুরানো।

এভাবে হাজার হাজার বছর কাটল। ক্রমে ক্রমে আরো নতুন ধরনের হাতিয়ার তৈরি হতে লাগল। পাথরের পরত তুলে

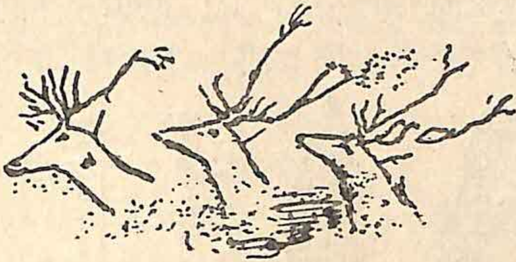


প্রত্নপ্রস্তরযুগের হাতিয়ার

চারপাশ একটু ধারাল করে নানা ধরনের হাতকুড়াল তৈরি হল। এগুলি দিয়ে কাটা, ছাঁটা, আঘাত করা, সব কাজই সম্ভব হত। এই রকম অনেক হাতকুড়াল উত্তরপশ্চিম ভারত এবং দক্ষিণভারতের মাটি

খুঁড়েও পাওয়া গেছে। লম্বা চ্যাপ্টা ধরনের কাটারি, ছ্যাঁদা করবার ছেদনী, এসবও তৈরি হত।

এই যুগের শেষদিকে পাথর ছাড়াও নানা জন্তুজানোয়ার এবং বড় বড় মাছের হাড়, হরিণের শিং, হাতির দাঁত ইত্যাদি দিয়েও হাতিয়ার তৈরি হত। পাথরের পরত দিয়ে তৈরী ছুরি, বর্শাফলক ইত্যাদিও তৈরি হত। গৃহস্থালী কাজে লাগে এমন বহু হাতিয়ারও তৈরি হত। এ যুগের মানুষ অনেক সময় কাঠ বা হাড়ের সঙ্গে ফলক ব্যবহার করে বর্শা বা কুড়াল বানাত। তীর, ধনুক, হাড়ের তৈরী বঁড়শি ও কোঁচ



প্রত্নপ্রস্তরযুগের গুহায় প্রাচীরখোদাই

ইত্যাদিও বানাত। শিকারের কাজে এসব লাগত। মৃত জানোয়ারের ছাল ছাড়াবার জন্যে চাঁছুনির দরকার হত। চামড়া থেকে পোশাক তৈরি করবার জন্যে চাঁছুনি, কাটারি, ছুঁচ ইত্যাদি লাগত।

কিন্তু চাষবাসের কোনো হাতিয়ার এ যুগে ছিল না। কেন না, মানুষ তখনো চাষবাস শেখে নি।

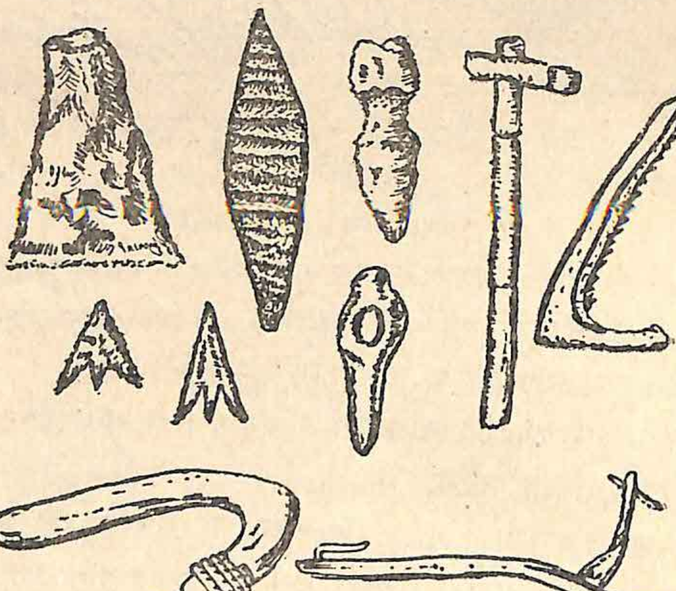
মানুষের আদিম কাল থেকে শুরু করে চাষবাস শেখার আগে পর্যন্ত মোটামুটি ৮/৯ লক্ষ বছর দীর্ঘ এই যুগকে পণ্ডিতেরা নাম দিয়েছেন **পুরানো পাথরের যুগ** বা **প্রত্নপ্রস্তর যুগ**।

নতুন পাথরের যুগ (নব্য প্রস্তরযুগ)

এখন থেকে প্রায় ৯/১০ হাজার বছর আগে শুরু হয়েছিল নতুন পাথরের যুগ। দুটি বড় বিষয়ে পুরানো পাথরের যুগের সঙ্গে এ-যুগের পার্থক্য ছিল। প্রথমতঃ, লোকেরা খাদ্যের জন্য কৃষিকাজ শুরু করেছিল। দ্বিতীয়তঃ, তারা নিজেদের প্রয়োজনে পশু পালন শুরু করেছিল।

৫/৬ লক্ষ বছর ধরে হাতিয়ারের উন্নতি করতে করতে নব্যপ্রস্তরযুগে পাথরের হাতিয়ার ও জিনিস তৈরিতে প্রচুর উন্নতি ও নিপুণতা দেখা দিয়েছিল। পাথর ঘসে ইচ্ছামত আকার দেওয়া হত হত এবং মসৃণ করা হত।

এযুগের প্রধান হাতিয়াগুলি উল্লেখ করা হল ঃ(১) **হাতুড়ি পাথর**—দেখতে কিছুটা পটলের মত, দু-প্রান্ত প্রায় ছুঁচাল। মাঝখানে বড় ছিদ্র। ছিদ্রে হাতল ঢুকিয়ে আঘাত করার কাজে ব্যবহৃত হত। (২) **গোল পাথর**—চ্যাপটা, কিনারা পাতলা, মাঝখানে ছিদ্র—বোধহয় হাতল ঢোকাবার জন্যে। (২) **কুড়াল বা খন্তার ফলক**—তিনকোণা, চওড়ার দিক বেশ ধারাল। লম্বা কাঠে লাগিয়ে খন্তা বা



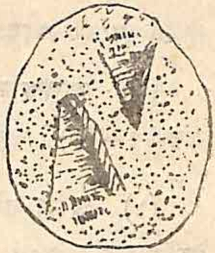
নব্যপ্রস্তরযুগের কিছু হাতিয়ার

শাবলের কাজ করা হত, বাঁকা গাছের ডাল বেঁধে কোদালের মতো মাটি কোপান হত, কুড়ালের মতো ব্যবহার করে গাছ কাটা হত। (৪) **T ফলক**—T-র মতো এই ফলকের উপর দিক ধারাল। এতে কাঠ ঘসে মসৃণ করা হত। (৫) **বাটালি**। (৬) **কাস্তে**—ধারাল অংশে খাঁজ কাটা। হাতল লাগিয়ে শস্য কাটা হত। (৬) **লাঙল**—

প্রথমদিকে হাড়, হরিণের শিং বা কাঠের ফলা দিয়ে তৈরি হত। পরে কঠিন পাথরের ফলক লাগান হত। এ দিয়ে কুড়াল বা খন্তার ফলকের চেয়ে তাড়াতাড়ি এবং বেশী জমি খোঁড়া যেত। (৮) ধারাল ছোরা। (৯) তীরের ফলক।

ভারতের বহু স্থানেও নব্যপ্রস্তরযুগের প্রচুর হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে। পূর্বভারতে আবিষ্কৃত হাতিয়ারগুলি সবচেয়ে মসৃণ এবং ধারাল। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং বর্ধমান জেলায়ও মসৃণ পাথরের কুড়াল পাওয়া গেছে।

ধাতুর হাতিয়ার—ক্রমে নব্যপ্রস্তরযুগে মানুষেরা তামা ও ব্রোঞ্জ খুঁজে পেল। (ব্রোঞ্জ হল টিনমেশান তামা)। তখন তামা ও ব্রোঞ্জ দিয়ে পাথরের চেয়ে আরো টেকসই হাতিয়ার তৈরি শুরু হল। তবে বেশীর ভাগ জায়গায় তখনো পাথর, হাড় ও কাঠের হাতিয়ার, এবং মাটির পাত্রই বেশী হত। তামা বা ব্রোঞ্জের হাতিয়ার কিছু কিছু তৈরি শুরু হলেও পাথরের হাতিয়ার তৈরির ছাঁচেই গলানো ধাতু ঢেলে তা তৈরি হত।



হাতিয়ার তৈরির পাথরের ছাঁচ

এ যুগের মানুষেরা যব, গম, জোয়ার, ধান ইত্যাদি খাদ্যশস্য উৎপাদন করত। মাছ ধরবার জাল বোনার জন্যে বা অন্য কাজের জন্যে শনের চাষও যথেষ্ট করত। আগের যুগের মতো খাদ্যসংগ্রহ করতেই সবটুকু সময় যেত না বলে মানুষ কিছু অবসর পেত এবং অন্যান্য কাজকর্মের দিকে মন দিতে পারত। কারণ, প্রত্নপ্রস্তরযুগের মানুষ ছিল খাদ্যের সংগ্রাহক, আর নব্যপ্রস্তরযুগে মানুষ হল খাদ্যের উৎপাদক। বিরাট পরিবর্তন।

নব্যপ্রস্তর যুগের বিপ্লবের অন্যান্য দিক

আমূল পরিবর্তনকে বলে বিপ্লব। প্রত্নপ্রস্তরযুগে মানুষ যেভাবে জীবনযাপন করত, নব্যপ্রস্তরযুগে তার আমূল পরিবর্তন হল। নানা দিকে এই বিপ্লবের চিহ্ন দেখা গেল।

(ক) **পশুপালন**—এসিয়ার মরূদ্যানগুলিতেই সর্বপ্রথম পশুপালন আরম্ভ হয়। এসব পশুর মধ্যে, ভেড়া, ছাগল, গোরু, মোষ, শুয়ার, ঘোড়া ইত্যাদি বিভিন্ন পশু পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পালিত হত। এসব পশুকে ভারবহনের কাজে লাগান হত। খাওয়াও হত। ক্রমে লাঙলটানার কাজে পশুব্যবহার শুরু হওয়ায় চাষের প্রচুর উন্নতি হল।

(খ) **মৃৎশিল্প**—হাতে এবং কুমোরের চাকায় এ-যুগের মানুষেরা নানারকম মাটির পাত্র তৈরি করত। বহু পাত্রে সুন্দর রং করা হত।

(গ) **বয়নশিল্প** (পোশাক)—এ যুগের মানুষেরা পশুর চামড়ার পোশাকই বেশী পরত। তবে সুতো দিয়ে বোনা কাপড়, পোশাক বা মাছ ধরার জালও এই যুগে প্রচলিত ছিল। এসব জিনিস বুনবার কাজে অনেক জায়গায় শনের সুতো ব্যবহৃত হত।

(ঘ) **বাসস্থান**—নব্যপ্রস্তরযুগে মানুষেরা তিন জায়গায় বাস করত :—(১) স্থলে (২) হ্রদে (৩) গুহায়।

(১) **স্থলে বসতি**—আত্মরক্ষার সুবিধা হয় এমন স্থানে গ্রাম তৈরি হত। গ্রামের মধ্যে থাকত সারিসারি কুটির। কুটির বা গ্রামের মধ্যে ৪ থেকে ৬ হাত গভীর গর্ত করে খাবার জিনিস বা শস্য রাখা হত। ঘরের দেওয়ালগুলি পাথরের বড় বড় চাংড়া দিয়ে সুরক্ষিত করা হত। গোল এবং আয়তাকার, এই দুরকম ঘর তৈরি হত। ঘরের দেওয়াল তৈরি হত মাটি দিয়ে। চালের ভারে যাতে ঘর ভেঙে না পড়ে, সেজন্যে অনেক সময় কাঠের খুঁটিও দেওয়া হত। (২) **হ্রদে বসতি**—আত্মরক্ষার জন্যে মানুষেরা কোথাও কোথাও হ্রদের জলে বাস করত। জলে খুঁটি পুঁতে তার উপর কাঠের পাটাতন পেতে কাঠের ঘর তৈরি হত। সুইজারল্যাণ্ডে এরকম ঘরের বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। সরু কাঠের-পুলের সাহায্যে ঘর থেকে তীরে যাওয়া হত এবং রাত্রে ঐ পুল সরিয়ে নেওয়া হত। যাতায়াতের জন্য নৌকা বা ডোঙাও ব্যবহৃত হত। (৩) প্রত্নপ্রস্তরযুগের মতো অত বেশী সংখ্যায় না হলেও নব্যপ্রস্তরযুগে কিছু কিছু মানুষ গুহায় বাস করত।

(ঙ) **পরিবহণ**—পশুকে পোষ মানাবার পর পশুর পিঠে মালপত্র

চাপিয়ে অনেক দূরে নিয়ে যাওয়া বা পাঠানোর সুবিধা হল। চাকা আবিষ্কারের ফলে সুবিধা শতগুণে বেড়ে গেল। কাঠের চাকা দিলে পশুদের পরিশ্রম কম হয়, পশুরা অনেকটা পথ মাল বহন করে নিয়ে যেতে পারে, এইসব ক্রমেই বুঝতে পারা গেল। ফলে, মালপত্র এবং মানুষ বহন করবার ক্ষেত্রে বিরাট বিপ্লব ঘটে গেল।

শুধু স্থলে নয়, জলের পথে পরিবহণের ক্ষেত্রেও বিপ্লব ঘটল। ডোঙা, ভেলা বা নৌকো তৈরি করা নব্য প্রস্তরযুগের প্রথম দিকেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। এরপর যখন এ-যুগের মানুষ পাল আবিষ্কার করল, তখন থেকে পালতোলা নৌকায় বা জাহাজে মালপত্র ও মানুষ পরিবহণের কাজে দ্রুত উন্নতি ঘটল।

(চ) বসতি স্থাপন, সামাজিক জীবন—সে-যুগে মানুষেরা দল বেঁধে এক একটা পাড়া বা গ্রামে বাস করত। সবাই জানত, একই পূর্বপুরুষ থেকে তারা জন্মেছে। পণ্ডিতেরা এ-রকম এক-একটা দলের নাম দিয়েছেন ক্ল্যান অর্থাৎ গোষ্ঠী। কাছাকাছি বাস করে এ-ধরনের কয়েকটি গোষ্ঠী মিলে যে বিরাট দল তৈরি হত, তার নাম ট্রাইব অর্থাৎ উপজাতি। অনেক সময় কয়েকটি গোষ্ঠী মিলে এক-একটি ফ্রাত্রি (অর্থাৎ ভাই ভাই সম্পর্ক) তৈরি হত, দু তিনটি ফ্রাত্রি মিলে ট্রাইব। ক্ল্যান বা গোষ্ঠীই ছিল সমাজের ভিত্তি।

গোষ্ঠীর মেয়েপুরুষ সবাই মিলে সভা করে গোষ্ঠীর কাজকর্ম কিভাবে চলবে ঠিক করত। সভায় সকলেরই সমান অধিকার ছিল। সভা করে বিজ্ঞ কাউকে মোড়ল হিসাবে নির্বাচন করা হত। গোষ্ঠীর সবাই সবাইকে সাহায্য করত, রক্ষা করত। জমি বা হাতিয়ার, কোনো কিছুরই উপর বিশেষ কারো দখল ছিল না—ক্ল্যানের সব-কিছুই ছিল ক্ল্যানের সকলের।

ট্রাইবের কাজ চালাবার জন্যেও সভা বসত। ক্ল্যানের মোড়ল বা সর্দাররা মিলে এই সভা করত। অনেক সময় জমি, খাদ্যশস্য ইত্যাদি নিয়ে ট্রাইবে ট্রাইবে লড়াই হত। বন্দীদের মেরে ফেলা হত, না হয় তাদের দিয়ে জমি চাষ করানো বা পশুপালন করানো হত।

সংস্কার, বিশ্বাস, ছবি—ক্ল্যানগুলির নাম হত কোনো পশু, পাখি গাছগাছড়া বা ফলের নাম দিয়ে। যে বস্তু বা প্রাণীর নাম থেকে পুরো ক্ল্যানের নাম, সেটি ছিল তাদের টোটেম। যেমন, কচ্ছপ ক্ল্যানের টোটেম—কচ্ছপ।

ধর্ম বা বিজ্ঞানের ধারণা তখনো সৃষ্টি হয়নি। সবাই জাদুতে বিশ্বাস করত, ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে জাদুর আশ্রয় নিত। যেমন, এক জায়গায় ভাবত, যব বা গম চাষ শুরুর আগে নাচতে নাচতে কোদাল-গুলো আকাশে ছুঁড়ে দিলে যব বা গমের শীষ আকাশ পর্যন্ত উঁচু হবে। নানা অঞ্চলে এইরকম নানা জাদুতে বিশ্বাস ছিল। এই জাদুবিশ্বাস থেকে এসেছিল গুহাচিত্র। মনের ইচ্ছাগুলিকে ছবি এঁকে পূরণ করা হত। মানুষ গোপনে ছবি এঁকে আসত দুর্গম গুহায়। ভাবত, যা আঁকা হল, প্রকৃতপক্ষে তাই ঘটবে। প্রত্নপ্রস্তরযুগে গুহাচিত্র খুব বেশী ছিল। নব্যপ্রস্তরযুগে গুহাচিত্রের সংখ্যা কমে এল। বেশীর ভাগ যুদ্ধের ছবি, নাচের ছবি, শিকারের ছবি। কোনো ছবিতে মানুষ হরিণের গায়ে তীর বিঁধিয়ে দিচ্ছে, কোনটিতে যুদ্ধে বা শিকারে যাবার আগে নাচছে, কোনটিতে মানুষেরা একপাল জন্তু-জানোয়ার নিয়ে



প্রস্তরযুগের গুহাচিত্র

চলছে। সব ছবির মূলেই জাদুবিশ্বাস, ছবি এঁকে ইচ্ছাপূরণের চেষ্টা।

(জ) ভাষা দিয়ে মনের ভাব বোঝানো—মুখের ভাষা আগের যুগেই চালু ছিল। নব্যপ্রস্তরযুগে অনেক জায়গায় মুখের ভাষাকে রূপ দেবার জন্যে অক্ষর বা লিপির প্রচলন হয়েছিল। অক্ষর বা লিপির প্রচলন হওয়ায় লেখার সুবিধা হল। মনের চিন্তাকে ভাষায় প্রকাশ করবার সুবিধাও হল। এ-যুগের শেষের দিকে

কোথাও কোথাও নগর গড়ে উঠেছিল। সেসব জায়গাতেই লিপির প্রচলন ছিল বেশী।

(ঝ) **ধর্ম বিশ্বাস ও দেবদেবী**—নানারকম কুসংস্কার, সংস্কার, ভয় ও ভক্তি থেকে এ-যুগে অনেক রকম দেবদেবীর পূজা করা হত। এসব দেবদেবীর মূর্তিও খুব প্রচলিত ছিল। অনেক মূর্তির মুখ নানারকম পশুপাখির মতো। অনেক মূর্তির মুখ মানুষের মতও ছিল। কৃষিকাজে যাতে বেশী শস্য উৎপন্ন হয়, সে কামনা করা হত নানা দেবীমূর্তির কাছে। এ-রকম দেবীমূর্তি নানা স্থানে পাওয়া গেছে। যেমন, এ-যুগের শেষদিক থেকে মিশরে কৃষির দেবতারূপে ওসাইরিস ও তাঁর স্ত্রী আইসিসের পূজা হত।

এক নজরে

(১) মানুষের সৃষ্টি ৮/১০ লক্ষ বছর আগে, কিন্তু সবচেয়ে পুরানো যে মানুষের কথা জানা গেছে, সেই পিকিং-মানুষ ৩ লক্ষ বছর আগের। এরা আগুনের ব্যবহার জানত। (২) মানবসভ্যতার দুই যুগ: প্রস্তর যুগ ও ধাতুযুগ। (৩) **প্রত্নপ্রস্তরযুগের** প্রধান হাতিয়ার প্রথমদিকে বড় পাথর দিয়ে তৈরী। তারপর হাড়, শিং, হাতির দাঁতে তৈরী। মানুষেরা চামড়ার পোশাক পরত, চাষ করত না, খাদ্য সংগ্রহ করে খেত। (৪) **নব্যপ্রস্তর যুগে** হাতিয়ার উন্নত হল, নানারকম হাতিয়ার তৈরি হল। পরের দিকে তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার শুরু হল। খাদ্যের **উৎপাদন** শুরু হল। (৫) **নব্যপ্রস্তরযুগে আরো পরিবর্তন**—(ক) পশুপালন (খ) কুমোরের চাকা, মাটির পাত্র তৈরি; (গ) সুতো তৈরি ও বোনার কাজ; (ঘ) বাসস্থান—স্থলে, হ্রদে, গুহায়। (ঙ) পরিবহণে পশুর ও চাকার ব্যবহার; পালতোলা নৌকা ও জাহাজ। (চ) সমাজ-জীবন—ক্ল্যান, ফ্রাত্রি, ট্রাইব। (ছ) জাদুবিশ্বাস, গুহাচিত্র। (জ) ভাষা—লিপি ও বর্ণমালা ব্যবহার, (ঝ) ভয়ে বা সংস্কারবশে বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস।

অনুশীলনী

১। 'পিকিং মানুষ' সম্পর্কে যা জান লেখ।
২। 'পিকিং মানুষ' আগুনের ব্যবহার জানত, কি করে বোঝা গেল?
৩। প্রত্নপ্রস্তরযুগের মানুষ কী ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করত?
৪। নব্যপ্রস্তরযুগে হাতিয়ার তৈরিতে কী উন্নতি দেখা গেল?
৫। নব্যপ্রস্তরযুগের প্রধান হাতিয়ারগুলির পরিচয় দাও।
৬। নতুন পাথরের যুগের পশুপালন সম্পর্কে যা জান লেখ।
৭। নব্যপ্রস্তরযুগের মৃৎশিল্প ও বয়নশিল্পের পরিচয় দাও।

৮। নব্য প্রস্তরযুগে লোকেদের বাসস্থান কেমন ছিল ?

৯। নতুন পাথরের যুগের পরিবহণ-ব্যবস্থা কেমন ছিল ?

১০। নব্যপ্রস্তরযুগের মানুষের সমাজজীবনের পরিচয় দাও।

১১। গোষ্ঠী ও উপজাতি কাকে বলে বুঝিয়ে দাও।

১২। প্রস্তর যুগের জাদুবিশ্বাস ও গুহাচিত্র সম্পর্কে বর্ণনা দাও।

১৩। নব্যপ্রস্তর যুগে ভাষার সৃষ্টি কেমন করে হল, সংক্ষেপে লেখ।

১৪। নব্যপ্রস্তর যুগের দেবদেবী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

নৈর্ব্যক্তিক

১। **শূন্যস্থান পূরণ কর** :—সবচেয়ে পুরানো যে মানুষের কথা জানা গেছে তাদের নাম—। পিকিং মানুষ প্রায়—লক্ষ বছর আগের। মানবসভ্যতার দুটি যুগ : প্রস্তরযুগ ও—। কয়েকটি গোষ্ঠী বা ক্ল্যান মিলে গড়ে উঠত এক একটি—। কচ্ছপ ক্ল্যানের টোটেম—।

২। **শুদ্ধ হলে ✓ এবং অশুদ্ধ হলে × চিহ্ন দাও** :—পিকিং মানুষেরা আগুনের ব্যবহার জানত। পিকিং মানুষেরা ঘরবাড়ি তৈরি করে থাকত। প্রস্তরযুগ ধাতুযুগের পূর্ববর্তী। পুরানো পাথরের যুগে চাষবাস ছিল না। পুরানো পাথরের যুগে ছুঁচের ব্যবহার ছিল না। নব্যপ্রস্তরযুগে লাঙল আবিষ্কৃত হয়েছিল। নব্যপ্রস্তর যুগে মুরগি পালন করা হত। নব্যপ্রস্তর যুগে মানুষেরা গাছে বাস করত। কয়েকটি ট্রাইব মিলে একটি ক্ল্যান গড়ে উঠত। টোটেম একরকম মানুষ।

৩। **এক কথায় উত্তর দাও** :—সবচেয়ে প্রাচীন যে মানুষের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, তাদের নাম কি ? প্রত্নপ্রস্তরযুগে যে পাথরের হাতিয়ার কাটা, চাঁছা, আঘাত করা ইত্যাদি নানা কাজে ব্যবহৃত হত, সেগুলির নাম কি ? পুরানো পাথরের যুগের মানুষেরা কিসের পোশাক পরতো ? যে বস্তু বা প্রাণীর নাম থেকে ক্ল্যানের নাম হত, তাকে কী বলা হয় ?

৪। **পাশে হ্যাঁ বা না লেখ** :—পিকিং-মানুষকে কি পুরোপুরি মানুষ বলা যায় ? পিকিং মানুষেরা কি আগুনের ব্যবহার জানত ? পিকিং মানুষেরা কি যাযাবর ছিল ? প্রত্নপ্রস্তরযুগের মানুষেরা ধাতু দিয়ে হাতিয়ার বানাত কি ? নব্যপ্রস্তরযুগের আগে ধাতু আবিষ্কৃত হয়েছিল কি ? নব্যপ্রস্তর যুগেই কি লিপি ও বর্ণমালা আবিষ্কৃত হয় ? ট্রাইবের আর এক নামই কি টোটেম ? ক্ল্যানের সম্পত্তি কি কেউ একলা ভোগ করতে পারত ?

হাতের কাজ

১। প্রত্নপ্রস্তরযুগের কয়েকটি হাতিয়ারের ছবি আঁক।

২। নব্যপ্রস্তরযুগের নতুন ধরনের কয়েকটি হাতিয়ারের ছবি আঁক।

৩। মাটি, কাঠ বা বাঁখারি ব্যবহার করে প্রত্নপ্রস্তরযুগ এবং নব্যপ্রস্তর যুগের কয়েকটি হাতিয়ার তৈরি কর।

৪। নব্যপ্রস্তরযুগের পালতোলা নৌকোর ছবি আঁক। কাঠ বা বাঁখারি দিয়ে নৌকো বানাও। ন্যাকড়া দিয়ে পাল তৈরি কর।

ইতিহাস প্রাচীনকালের কথা। তাই ইতিহাস ভালোভাবে বুঝতে হলে সময়ের ব্যাপারে ধারণা থাকা খুব দরকার। বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে যেসব প্রধান ঘটনার বা বিষয়ের বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলির যথাসম্ভব শুদ্ধ সময় উল্লেখ করা হল। তবে অতি প্রাচীনকালের সময় পণ্ডিতদের অনুমান অনুযায়ী দেওয়া হল।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(প্রস্তরযুগ)

৫ লক্ষ খ্রী. পূ.	
* ৪ " "	পুরানো পাথরের যুগ চলছে
* ৩ " "	পিকিং মানুষ
* ২ " "	
* ১ " "	
* ২৫০০০ "	চীনে মানুষের বসতি (প্রত্নপ্রস্তর)
১৮ হাজার থেকে ১৫ হাজার	মেসোপোটেমিয়া, মিশর ও ভারতবর্ষে নতুন পাথরের যুগ শুরু

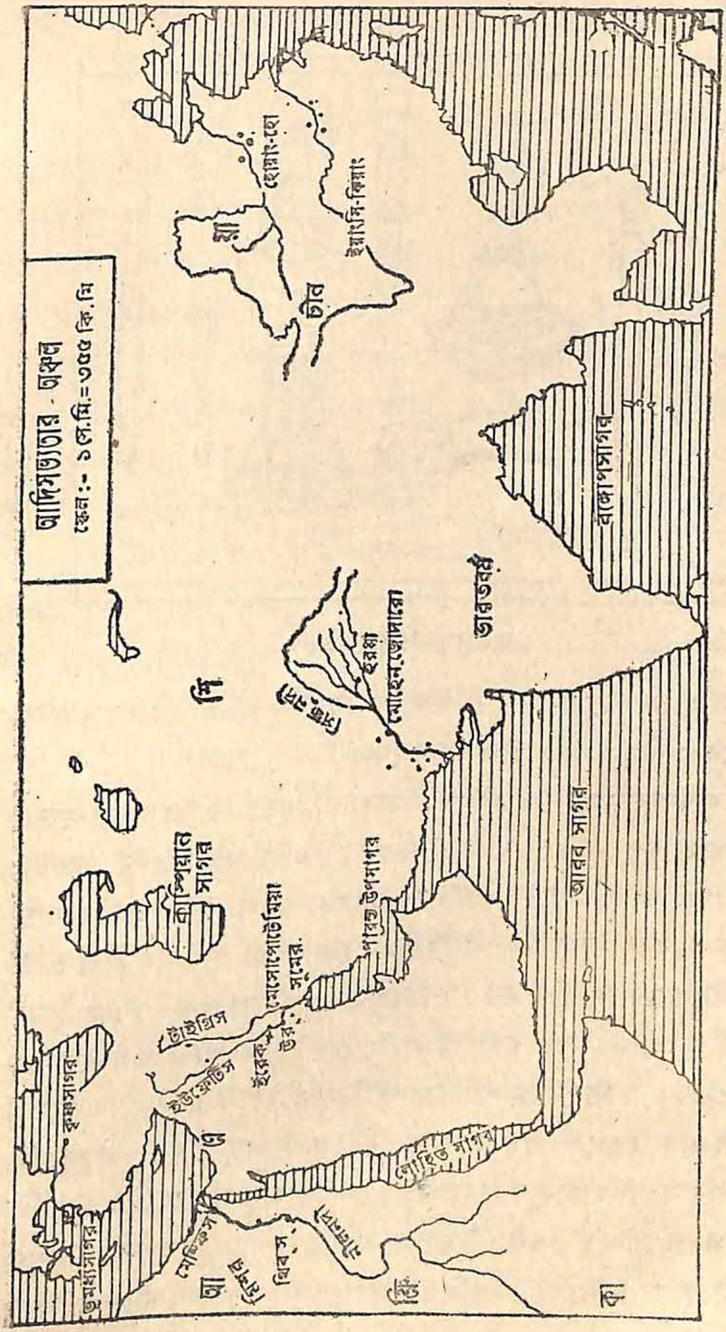
তৃতীয় অধ্যায়

তামা-ব্রোঞ্জের যুগ

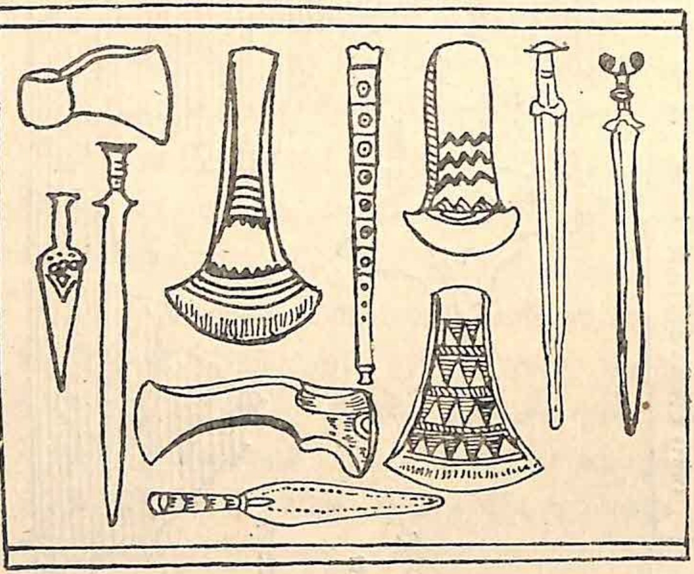
তামা-ব্রোঞ্জের যুগ শুরু হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ৮ হাজার বছর আগে। প্রথমে এসিয়ায়, তারপর আফ্রিকায়। সর্বপ্রথম নগরসভ্যতা গড়ে উঠেছিল মেসোপোটেমিয়া, মিশরে ও ভারতবর্ষে, তারপর চীনে।

নগরের জন্ম—তামা-ব্রোঞ্জের যুগে পারস্য উপসাগরের উত্তরদিকে **ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস** নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম নগরসভ্যতার জন্ম হয়। এই দুটি নদীই এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে পারস্য উপসাগরে পড়েছে। তখন সে অঞ্চলের নাম ছিল সুমের। সুমের দেশে সেই যুগে ইরেক, এরিদু, লাগাস্, উর্ প্রভৃতি নগর গড়ে ওঠে। অবশ্য সেসব নগর এখনকার মত বড় নয়। ইরেকের আয়তন ছিল প্রায় দু বর্গমাইল। তবে সে-যুগের একটি বড় গ্রামের আয়তন ছিল এখনকার একটি ছোটখাটো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মত। সুতরাং সে-তুলনায় ইরেক তো বিশাল নগরই ছিল। আফ্রিকার মিশরে নীল নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে, ভারতে সিন্ধুনদীর কাছাকাছি অঞ্চলে এবং এসিয়া-মাইনরের নদী-উপত্যকায়ও নগর-সভ্যতা গড়ে ওঠে।

উৎপাদনব্যবস্থার পরিবর্তন—বিশেষ কাজে বিশেষ লোক—এযুগে বিশেষ করে নগরগুলিতে তামা এবং ব্রোঞ্জ দিয়ে হাতিয়ার তৈরির কাজ বেড়ে গেল। চাষের কাজে যত লোক নিযুক্ত থাকত, সেই তুলনায় অনেক বেশী খাদ্য উৎপন্ন হত। তাই বহু লোক হাতিয়ার তৈরি, মাটির জিনিস তৈরি ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত থাকার সুযোগ পেত। সেইসব কাজের বদলেই তারা খেতে পেত। এইভাবে বিশেষ বিশেষ কাজে বিশেষ ধরনের লোকেরাই নিযুক্ত থাকতে লাগল। তাতে নিজের নিজের কাজে তারা ক্রমেই নিপুণ হয়ে উঠত—সমাজও তাদের কাছে ভাল জিনিস পেত। তামা-ব্রোঞ্জ যুগের শেষ দিকে মাটির পাত্র তৈরি, পাথরের বাড়ি তৈরি, চামড়া


আদিসভ্যতার অঞ্চল
স্কেল:- ১সে.মি.= ৭৫০ কি.মি
চীন
হোয়াং-হো
ইয়াংসি-কিয়াং
ভারতবর্ষ
হরপ্পা
মোহেন্-জো-দারো
বঙ্গোপসাগর
আরব সাগর
পারস্য উপসাগর
মেসোপটেমিয়া
সুমের
টাইগ্রিস
ইউফ্রেটিস
কাস্পিয়ান সাগর
কৃষ্ণসাগর
ভূমধ্যসাগর
লোহিত সাগর
মেম্ফিস
থিবস

তৈরি, পোশাক তৈরি, অলঙ্কার তৈরি, অস্ত্রশস্ত্র তৈরি, পিটিয়ে বা ছাঁচে



ব্রোঞ্জযুগের কিছু হাতিয়ার

ফেলে ধাতুর জিনিস তৈরি ইত্যাদি বহুরকম কাজে বিশেষ শ্রেণীর লোকেরা নিযুক্ত ছিল বলে জানা গেছে।

ব্যবসাবাণিজ্য—চাষবাসে যারা নিযুক্ত, তারা খাদ্যশস্যের পরিবর্তে অন্য জিনিস যোগাড় করত। যারা অন্য জিনিস তৈরির কারিগর, তারা তাদের তৈরি জিনিসের বদলে খাদ্যশস্য যোগাড় করত। যেসব জায়গায় বেশী উৎপাদন হত, সেসব জায়গার মধ্যে তাই জিনিসপত্রের লেনদেন হত। ভারবহনের জন্য পশু এবং পশুতে-টানা গাড়ি ব্যবহারের ফলে স্থলপথে বাণিজ্যের উন্নতি ঘটল। জলপথে বড় বড় নৌকা বা জাহাজের সাহায্যে বাণিজ্যের উন্নতি ঘটল। জিনিসের বদলে দাম হিসাবে পশু বা অন্য জিনিস দেওয়া হত। ধাতুমুদ্রার ব্যবহার সম্ভবতঃ এ যুগের একেবারে শেষদিকে চালু হয়েছিল।

সমাজজীবনে শ্রেণীর উদ্ভব—যেসব জায়গাতে ধনসম্পদে পরিপূর্ণ নগরী গড়ে উঠেছিল, সেগুলির অধিকাংশ সম্পদের মালিক ছিল নগরদেবতারা অথবা সেই দেবতাদের প্রতিনিধি হিসাবে বিশিষ্ট পুরোহিতেরা। এই পুরোহিতরা খুবই সুখে জীবন কাটাত, কেন না

দেবতার নামে যেসব জিনিস সাধারণ লোকের কাছ থেকে আদায় করা হত, তার অধিকাংশই এই পুরোহিতদের ভোগে লাগত। আর সাধারণ চাষী, কারিগর প্রভৃতির জীবন কাটত দুঃখকষ্ট ও অভাবের মধ্যে। ভাগচাষী, দিনমজুর, মন্দিরের কারিগর, ক্রীতদাস প্রভৃতি লোকেদের পেটভরা খাবার জুটত না। এইভাবে সমাজে শোষক এবং শোষিত এই দুটি শ্রেণী স্পষ্ট হয়ে উঠল। প্রাচীন ক্ল্যান সমাজের সমানভাব আর রইল না।

ট্রাইবে ট্রাইবে ঝগড়া—যেসব ট্রাইব নদীর ধারেকাছে বাস করত, তারা বেশ বুঝল যে, উর্বর জমির মালিক হলে সুখে জীবন কাটানো যাবে। নদীর জলের মালিক হলে জলসেচ করা যাবে, নৌকা বা জাহাজের সাহায্যে বাণিজ্য করা যাবে। ধনদৌলতের জোরে যারা ট্রাইবের রাজা হয়ে বসত, নিজের সম্পত্তি বাড়াবার লোভ তাদের আরো বেশী হত। সুবিধাবাদী পুরোহিত-শ্রেণীও লোভী ছিল। সুমেরের উত্তরে সেকালে আক্কাদ নামে এক অঞ্চল ছিল। নদীর জল বা জমিজমা নিয়ে সেখানকার রাজাদের সঙ্গে সুমেরের রাজাদের ঝগড়াঝাঁটি, যুদ্ধবিগ্রহ প্রায়ই লেগে থাকত। মিশরে নীলনদীর ধারের ট্রাইবগুলির মধ্যেও দীর্ঘকাল যুদ্ধবিগ্রহ চলেছিল। অনুমান করা যায়, সিন্ধুতীরের ট্রাইবগুলির মধ্যেও এরকম চলত। পরাজিত বন্দীদের দিয়ে ক্রীতদাস বা খেতমজুরের কাজ করানো হত। বিজয়ী রাজার সম্পদ বাড়ত, কিন্তু দরিদ্রের অবস্থা থাকত একই রকম।

রাষ্ট্রের উদ্ভব—ট্রাইবের রাজা নগরে থাকত। কোথাও কোথাও পুরোহিতরা রাজা হয়ে বসত। নিজেদের ক্ষমতা এবং সম্পদ সুরক্ষিত রাখার জন্যে এরা নানারকম আইনকানুনের প্রচলন করত। সেইসব আইন চালাবার জন্যে সৈন্যসামন্তের ব্যবস্থাও হত। কেউ আইন ভাঙলে তার শাস্তি হত। শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হত। রাজ্যের একটা মোটামুটি সীমাও ছিল। অন্য রাজা সেই সীমা লঙ্ঘন করলে লড়াই বাধত। এখনকার পৃথিবীতে ভারত, বাংলাদেশ ইত্যাদি সব রাষ্ট্রও এইভাবেই চলে, তবে আরো অনেক গোছালো ভাবে। তাছাড়া এখনকার রাষ্ট্রগুলির সীমারেখা নির্দিষ্ট

—একেবারে মানচিত্রে পাকাপাকি ছাপা। তাহলেও মোটামুটি এক ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা ঐ প্রাচীন যুগে চালু হয়ে গিয়েছিল।

নদীউপত্যকায় সভ্যতা গড়ে ওঠার কারণ—নদী যে অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাকে বলে নদী-উপত্যকা। তামা-ব্রোঞ্জের যুগে বিভিন্ন মহাদেশে নগরসভ্যতা গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন নদী-উপত্যকায়। মেসোপোটেমিয়ায় ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস, মিশরে নীল, ভারতবর্ষে সিন্ধু এবং চীনে হোয়াংহো আর ইয়াংসি-কিয়াং নদীর উপত্যকায় আদি নগরসভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। তার নানা কারণ আছে।

প্রথমতঃ, এইসব নদী-উপত্যকায় নদীগুলি প্রতি বছর বন্যা ঘটাত। বন্যায় পলি পড়বার ফলে খুব ভাল চাষবাস হত। দ্বিতীয়তঃ, নদীগুলিতে দরকারমত বাঁধ দিয়ে বন্যা কমানো যেত এবং অসময়ে চাষের জন্যে জল পাবার ব্যবস্থা করা যেত। তৃতীয়তঃ, এইসব উপত্যকা-অঞ্চলে তামা, ব্রোঞ্জ, টিন, সোনা, রুপো ইত্যাদি পাওয়া যেত। চতুর্থতঃ, নদীতে নৌকা ও জাহাজ চালানো যেত বলে নিজেদের উদ্‌বৃত্ত জিনিসপত্র অন্যত্র রপ্তানী করা যেত, পরিবর্তে অন্য অঞ্চল থেকে দরকারি জিনিস আমদানি করা যেত। বাঁধ দেবার জন্যে ও ঘরবাড়ি তৈরির জন্যে যেসব পাথর, ইট, কাঠ লাগত, তাও নদীপথে আনা যেত।

এক নজরে

(১) তামা-ব্রোঞ্জ যুগে প্রথম নগরসভ্যতার পত্তন সুমেরে। তারপর মিশরে। তারপর প্রাচীন ভারতে সিন্ধু-উপত্যকায়। (২) বিশেষ বিশেষ জিনিস উৎপাদন করত বিশেষ বিশেষ শ্রেণী। (৩) উদ্‌বৃত্ত জিনিস নিয়ে স্থলপথে ও জলপথে ব্যবসাবাণিজ্য চলত। (৪) ধনী ও দরিদ্র, এই দুই শ্রেণীর উদ্ভব হল। (৫) জমিজমা ও নদীর জল নিয়ে ট্রাইবে ট্রাইবে যুদ্ধবিগ্রহ চলত। (৬) রাষ্ট্রের উদ্ভব হল। (৭) নদী-উপত্যকায় নগরসভ্যতা গড়ে উঠবার কারণ :—উর্বর মাটিতে ভাল চাষবাস, বন্যানিয়ন্ত্রণ ও জলসেচ, নানা ধাতু পাবার সুবিধা, জলপথে বাণিজ্যের ও মালপত্র আমদানির সুবিধা।

অনুশীলনী

নিবন্ধধর্মী ও ছোটউত্তরধর্মী

১। নদী-উপত্যকায় প্রথম নগরসভ্যতা গড়ে ওঠার কারণ কি?
২। আদি নগরসভ্যতায় কেমনভাবে শ্রেণীর উদ্ভব হল?

৩। তামাব্রোঞ্জ যুগে ট্রাইবে ট্রাইবে প্রায়ই লড়াই হত কেন ?
৪। তামাব্রোঞ্জ যুগে কেমনভাবে ব্যবসাবাণিজ্য চলত ?
৫। তামাব্রোঞ্জ যুগে কোথায় নগর গড়ে উঠেছিল ?

নৈর্ব্যক্তিক

১। **শূন্যস্থান পূরণ কর :**—সর্বপ্রথম নগর গড়ে ওঠে—এ। ইউফ্রেটিস—উপসাগরে পড়েছে। মোহেন্‌জোদারো—নদীর উপত্যকায় অবস্থিত। নগরদেবতাদের প্রতিনিধি ছিল—। মিশরে নগর গড়ে উঠেছিল—নদীর উপত্যকায়।

২। **শুদ্ধ হলে ✓, অশুদ্ধ হলে × চিহ্ন দাও**—তামাব্রোঞ্জের যুগে সর্বপ্রথম নগরসভ্যতা গড়ে ওঠে ইউরোপে। ইরেক শহরটি গড়ে উঠেছিল নীল নদীর ধারে। তামাব্রোঞ্জ যুগে যারা হাতিয়ার গড়ত, তাদের চাষ করতে হত না। সুমের অঞ্চলে দাম হিসাবে ধাতুমুদ্রাও ব্যবহৃত হত। নগরের সম্পত্তি থাকত প্রায়ই নগরদেবতার নামে। তামাব্রোঞ্জ যুগে ট্রাইবগুলির মধ্যে কোনো যুদ্ধবিগ্রহ হত না।

হাতের কাজ

১। খাতায় একই মানচিত্রে নীল নদীর ধারের, সুমের-অঞ্চলের এবং সিন্ধুনদীর নগরসভ্যতার অঞ্চলগুলি শেড দিয়ে আঁক। ঐসব অঞ্চলের নামকরা নদীগুলিও মানচিত্রে আঁক। নাম দাও—আদি নগরসভ্যতা।

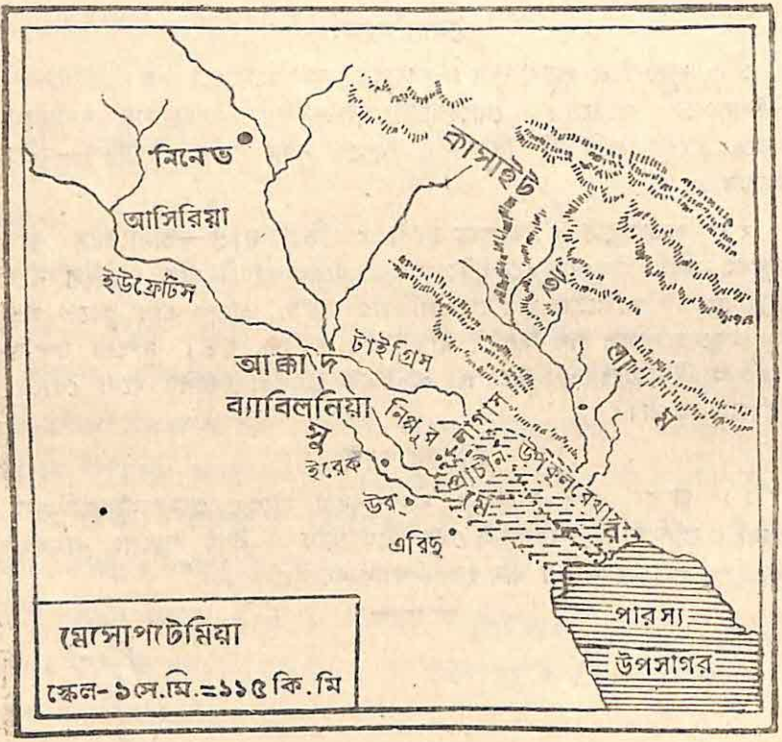
চতুর্থ অধ্যায়

কয়েকটি প্রাচীন সভ্যতার কথা

(১) মেসোপোটেমিয়া

অবস্থান, প্রাচীনত্ব—প্রথম সভ্যতা—গ্রীকভাষায় মেসোপোটেমিয়া বলতে বোঝাত দুই নদীর মাঝখানের দেশ। এই নদী দুটি হল ইউফ্রেটিস আর টাইগ্রিস। এই দুটি নদী এখন ইরাক দেশের মধ্য দিয়ে গিয়ে একসঙ্গে মিশে পারস্য-উপসাগরে পড়ছে। প্রাচীনকালে মেসোপোটেমিয়ার দক্ষিণ-অঞ্চলের নাম ছিল সুমের। এখানকার মানুষ কোনদিনই এ-অঞ্চলকে মেসোপোটেমিয়া বলত না—ও নামটা অনেক পরে গ্রীকরা দিয়েছিল। পারস্য-উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই সুমেরে খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে নগরসভ্যতার পূর্ণরূপ দেখা গিয়েছিল।

এই সভ্যতাই সম্ভবতঃ সবচেয়ে প্রাচীন মানবসভ্যতা। ঐ সময় সুমেরে ২০টিরও বেশী নগররাজ্য ছিল। রাজায় রাজায় প্রায়ই লড়াই হত।



মেসোপটেমিয়া
স্কেল-১সে.মি.=১১৫কি.মি

মেসোপোটেমিয়ার উত্তর অঞ্চলে কিছুদিন পরে আক্কাদ রাজ্য গড়ে ওঠে। আক্কাদীয়রা খ্রীষ্টপূর্ব আঠারো শতকে সুমের দখল করে নেয়। কিছুকাল পরে পূর্বদিক থেকে অ্যামোরাইট জাতিও আবার সুমের দখল করে। আরো নানা জাতি বহুবার সুমের আক্রমণ করেছে। কিন্তু আক্রমণকারীরা এসে সুমের সভ্যতাই মেনে নিয়েছে, তাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। তাই এই আদি মানবসভ্যতা প্রায় চার হাজার বছর ধরে টিকে ছিল। সবচেয়ে প্রাচীন ও বড় শহর ছিল ইরেক। এছাড়া এরিদু, লাগাস্, উর প্রভৃতিও বিখ্যাত শহর ছিল।

উর্বর মাটি, নানারকম শস্য—মেসোপোটেমিয়ার মধ্যে সুমেরের মাটিই ছিল সবচেয়ে উর্বর। উত্তর-অঞ্চলে পাহাড়িয়া জমি বেশী ছিল। অতি প্রাচীনকালে পারস্য-উপসাগর আরো ২০০ কিমি. উত্তর পর্যন্ত

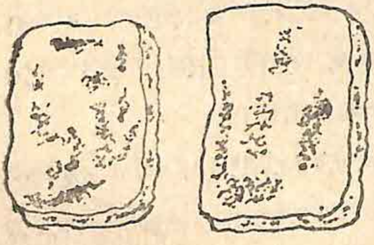
বিস্তৃত ছিল। উত্তর-অঞ্চলের পার্বত্যভূমি থেকে উৎপন্ন ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস বহু সহস্র বছর ধরে বিপুল পরিমাণ পলি বয়ে নিয়ে আসত। এই পলিমাটি দিয়েই ক্রমে গড়ে ওঠে সুমেরের বিরাট উর্বর অঞ্চল। প্রতি বছর নদী দুটি মার্চ থেকে জুলাই এর মধ্যে বন্যা ঘটাত। বন্যার জল একটু কমলেই মানুষেরা বীজ ছড়াত। যে-পরিমাণ বীজ ছড়াত, তার ৯০।১০০ গুণ ফসল হত। প্রচুর পরিমাণে যেসব খাদ্যশস্য ফলান হত, তার মধ্যে প্রধান ছিল বার্লি আর গম। এছাড়া শন এবং তিলের চাষও প্রচুর হত। বেশীর ভাগ লোকই চাষবাস করত। নগরদেবতা কিংবা রাজাকে উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ খাজনা হিসাবে দিতে হত। চাষীরা দল বেঁধে চাষ করে কোনোমতে পেট চালাত। তারা ছিল নিতান্তই খেটে খাওয়া গরিবমানুষ।

বন্যার বিরুদ্ধে লড়াই—৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সুমের-সভ্যতার যখন পরিপূর্ণ রূপ, তখন এখানকার লোকেরা বন্যানিয়ন্ত্রণের কাজে রীতিমত দক্ষ হয়ে উঠেছিল। তারও আগের তিনহাজার বছর ধরেই এই কাজের জন্যে তারা চেষ্টা করে আসছিল। কেন না বন্যার পরে চাষবাসের সুবিধা হত বটে, কিন্তু বন্যার তোড়ে সময় সময় গোটা দেশটাই ভেসে যেত। পলিমাটির দেশ, তাই বাঁধ দেবার পাথর পাওয়া যেত না। কিন্তু ইউফ্রেটিস এবং টাইগ্রিস থাকায় বড় নৌকা বা জাহাজে দূর থেকে পাথর আনবার সুবিধা হল। পাথর দিয়ে বাঁধ তৈরি করে বন্যার জল আটকাবার ব্যবস্থা হত। বেশী জল ধরে রাখবার জন্যে চারিদিকে বাঁধ দিয়ে বিশাল জলাধার তৈরি হত। খাল কেটে বন্যার জল বা জলাধারের জল খালের মধ্য দিয়ে বইয়ে দূরের শুকনো জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হত। এইভাবে অবাধ্য বন্যার বিরুদ্ধে সবাই মিলে লড়াই করে সুমেরের মানুষেরা সেই জল দিয়ে ফসল ফলাত।

অন্যান্য পেশা—কৃষি ছাড়াও সুমেরের লোকেরা অন্য বহুরকম পেশায় নিযুক্ত ছিল। নগরদেবতার পুরোহিতরাই ছিলেন সবচেয়ে ক্ষমতাশালী সম্প্রদায়। অনেক মন্দিরে নারী-পুরোহিতও থাকত। বিদ্যাচর্চার ব্যাপারটা বহুদিন পর্যন্ত পুরোহিতদেরই অধীনে ছিল।

পুরোহিতদের অধীনে কেরানী, চিকিৎসক, জাদুকর, সেবকমণ্ডলী, কোষাধ্যক্ষ, সরকার, বিভাগ-পরিচালক ইত্যাদির বিরাট দল থাকত। তাছাড়া ক্ষমতাশালী ছিলেন রাজারা। রাজার অধীনে থাকত বিরাট দল—কেরানী, মন্ত্রী, হিসাবরক্ষক, প্রতিনিধি, দলনেতা, প্রহরী ইত্যাদি। রাজার অধীনে প্রাদেশিক শাসনকর্তারাও ছিলেন প্রায় খুদে রাজা। তাদের ঘিরেও বিরাট বহর। অনেক সময় পুরোহিতরাই রাজা হয়ে বসত। সাধারণ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশ ছিল নানা ধরনের কৃষক। এছাড়া প্রচুর লোক নানা রকম কারিগরি কাজে নিযুক্ত ছিল। মাটির পাত্র তৈরি ও রং করা, পাথরের বাড়ি তৈরি, চামড়া তৈরি ও পাকানো পশম ও চামড়ার পোশাক তৈরি, ধাতুর হাতিয়ার তৈরি—এসব ছিল প্রধান কারিগরি কাজ। বহু মানুষ পশুপালনে নিযুক্ত ছিল। স্বাধীনভাবে যারা পশুপালন করত, তাদের বেশ মর্যাদা ছিল। জাহাজের মালিকরাই সাধাররতঃ ব্যবসাবাণিজ্য করতেন। সম্ভবতঃ কিছু লোক দোকানদারিতেও নিযুক্ত থাকতেন। কিছু লোক ছিল ধনী, সম্পত্তির মালিক। অনেক লোক চাকরের কাজ করত। ক্রীতদাস তো ছিলই। বন্দী শত্রুসৈন্যকে দিয়ে বা খাজনা দিতে অক্ষম ব্যক্তিকে দিয়ে বিনা পয়সায় খাটানর ব্যবস্থা ছিল। বহু লোক সাময়িকভাবে সৈন্যের কাজ করত।

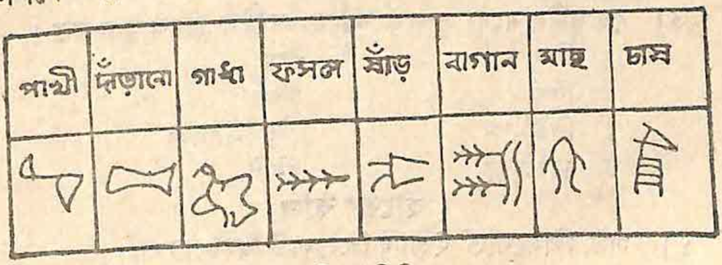
সুমেরীয়দের কৃতিত্ব—সেই সুপ্রাচীন যুগে সুমেরীয়রা বহু কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বগুলি সংক্ষেপে বলা হয়। (১) **মনোরম উচ্চ অট্টালিকা**—ইরেক, উর, কিশ, ইত্যাদি বহু শহরেই প্রধান বাড়িগুলি হত ইটের তৈরি বহুতল উঁচু অট্টালিকা। অনেকটা জায়গা জুড়ে নিচের তলা তৈরি করা হত। তার উপর আর একতলা একটু কম আয়তনে তৈরি হত। ফলে, তার চারপাশে বেশ ফাঁকা জায়গা থাকত। এভাবে সাত আট তলা অট্টালিকা তৈরি হত। এগুলির নাম ছিল 'জিগ্গুরাট'।



সুমেরুর ইট

(২) কাদা ও ইটের তৈরী মন্দির—আঠাল কাদা দিয়ে ইট গেঁথে প্রত্যেক শহরেই বড় বড় মন্দির তৈরি হত। ইরেক শহরের মন্দিরটি লম্বায় প্রায় পঁচাত্তর মিটার এবং চওড়ায় প্রায় চৌত্রিশ মিটার ছিল। নানা দেশ থেকে দামী আসবাব, পাথর, কাঠের দরজা-জানালা এনে অট্টালিকা ও মন্দিরগুলি সাজান হত। দেওয়ালগুলিতে চুনকাম করা হত। (৩) প্রাচীরচিত্র ঃ—অট্টালিকা ও মন্দিরগুলির গায়ে বিরাট বিরাট ছবি আঁকা হত। 'ষ্টাকো' অর্থাৎ একজাতীয় প্রলেপ দিয়ে দেয়ালের গায়ে সুন্দর ছবি তৈরির প্রথা ছিল। দেয়াল-সাজানোর জন্যে পোড়ামাটির মূর্তি ও অলঙ্করণ প্রচুর ব্যবহৃত হত। (৪) পাথর খোদাই—মন্দির বা অট্টালিকায় সৌন্দর্য বাড়াবার জন্যে মাঝে মাঝে খোদাইকরা পাথর ব্যবহার করা হত। সবচেয়ে বিস্ময়কর পাথর-খোদাইএর কাজ রাজা হাম্মুরাবির আইন-সম্পর্কিত বিশাল শিলালিপি। যুদ্ধযাত্রা, সেকালের মানুষের জীবনযাত্রা ইত্যাদির নানা দৃশ্যও পাথরে খোদাই করা হত।

(৫) ধাতুবিদ্যা—ধাতুবিদ্যার প্রচুর উন্নতি ঘটেছিল। তামা ও ব্রোঞ্জ দিয়ে নানারকম পাত্র তৈরি হত। ব্রোঞ্জ গলিয়ে ছাঁচে ফেলে রাজা বা ধনীব্যক্তিদের মূর্তি তৈরি হত। সেসব মূর্তিতৈরির দক্ষতা সত্যই প্রশংসনীয়। তাছাড়া যুদ্ধবিগ্রহ অবিরত লেগে থাকত বলে ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে সুমেরীয় কারিগরেরা খুবই দক্ষ ছিল। (৬) পরিবহণ ও বাণিজ্য—পশুচালিত গাড়িতে, মানুষ বা পশুর পিঠে চাপিয়ে, জিনিসপত্রের লেনদেন হত দূর দূর অঞ্চলে। তবে জলপথে বাণিজ্য চলত অনেক বেশী। পালতোলা জাহাজে



কিউনিফর্ম লিপি

সুমেরীয়রা মিশর, ইউরোপ, উত্তরপশ্চিম ভারত ইত্যাদি নানা দেশে

বাণিজ্য চালাত। (৭) **লিপি**—সুমেরীয়রা কাদামাটির নরম চাকতির উপর সরু করে কাটা নলখাগড়া দিয়ে লিখত। তাদের লিপিকে বলা হয় 'কিউনিফর্ম'।

এক নজরে (১) পারস্য উপসাগরের উত্তর উপকূলে সুমের অঞ্চলে সর্বপ্রথম নগরসভ্যতা গড়ে ওঠে। (২) সুমেরের উর্বর পলিমাটিতে বার্লি, গম, শন, তিল ইত্যাদি প্রচুর হত। (৩) সুমেরীয়রা বাঁধ, খাল, জলাধার ইত্যাদি তৈরি করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করত। (৪) লোকেরা নানা পেশায় নিযুক্ত থাকত :—পুরোহিত ও তাঁদের দলবল, রাজা ও তাঁর দলবল, কৃষক, কারিগর, বাড়ির মিস্ত্রি, দর্জি, পশুপালক, ক্রীতদাস, সৈন্য ইত্যাদি। (৫) সুমেরীয়রা নানাদিকে কৃতিত্ব দেখিয়েছিল :—জিগগুরাট তৈরি, মন্দির তৈরি, প্রাচীর চিত্র, পাথরখোদাই (হাম্মুরাবির শিলালিপি), ধাতুবিদ্যা, পরিবহণ ও বাণিজ্য, লিপিব্যবহার (কিউনিফর্ম)।

অনুশীলনী

নিবন্ধধর্মী ও ছোটউত্তরধর্মী

১। মেসোপোটেমিয়ার সুমেরুসভ্যতার কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

২। প্রথম মানবসভ্যতা কোন্ অঞ্চলে কতদিন আগে গড়ে উঠেছিল ?

৩। সুমেরীয়দের কৃষিকাজ ও বন্যানিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিবরণ দাও।

৪। কৃষি ছাড়া সাধারণ সুমেরীয়রা আর কি কি কাজ করত ?

নৈর্ব্যক্তিক

১। **হ্যাঁ কিংবা না লেখ :**—পারস্য উপসাগর সুমেরের দক্ষিণে। সুমেরের অনেক লোক দর্জির কাজ করত। সুমেরে এক শহরের নাম ছিল এরিদু। সুমেরের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চলত। সুমেরে খুব বন্যা হত।

২। **এক কথায় উত্তর লেখ :**—সুমেরের সবচেয়ে প্রাচীন শহরের নাম কি ছিল? এই প্রাচীনতম শহরটিই কি সবচেয়ে বড় শহর ছিল? সুমেরের চাষীরা কি ধনী ছিল ? সুমেরের মন্দিরে নারীপুরোহিত ছিল কি ? জিগগুরাট কি পাথর দিয়ে তৈরি হত না ?

৩। **যে দুটির মধ্যে সম্পর্ক আছে, লাইন টেনে যুক্ত কর :**—

জিগ্গুরাট	শহর
কিশ্	মন্দির
কিউনিফর্ম	উঁচু অট্টালিকা
নগরদেবতা	লিপি

হাতের কাজ

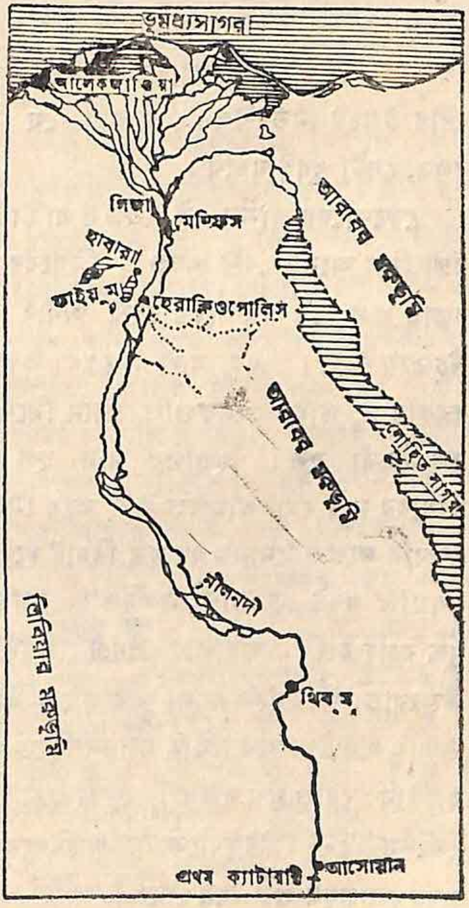
১। মাটি, পিসবোর্ড ইত্যাদি দিয়ে একটি জিগগুরাট বানাও।

২। মানচিত্র এঁকে সুমের, টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস, পারস্য উপসাগর দেখাও। মানচিত্রে মেসোপোটেমিয়া ছাড়া উত্তর-পশ্চিম ভারতও দেখাও।

(২) মিশর

অনেকে মনে করেন, মিশরের নীলনদীর উপত্যকায় যে আদি সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তা মেসোপোটেমিয়ার সভ্যতার মতই প্রাচীন।

অবস্থান, ভূপ্রকৃতি ইত্যাদি—মেসোপোটেমিয়ার ১২/১৩ শ কিলোমিটার পশ্চিমে মিশর। এই দেশটি আফ্রিকার একেবারে উত্তর অঞ্চলে। মিশরের উত্তরে ভূমধ্যসাগর, পশ্চিমে মরুভূমি, পূর্বে মরুভূমি এবং দক্ষিণে সুদান। ৬৪০০ কিমি. দীর্ঘ নীলনদীর শেষ অংশ এই দেশটির মধ্য দিয়ে প্রায় ৮০০ কিমি. প্রবাহিত হয়ে ভূমধ্যসাগরে পড়েছে। মিশরের লোকেরা এই নদীকে বলত 'হাপি'। ওদের ভাষায় এর মানে 'নদী'। গ্রীকেরা নাম দেয় 'নাইল' বা 'নীল' (Nile)। এই নদীর মোহনায় বিরাট বদ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীন কাল থেকেই নীলনদী প্রতি বছর জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত দুই তীরে বন্যা ঘটায়। এর ফলে দুই তীরের জমি অসাধারণ উর্বর। তাই নব্যপ্রস্তরযুগ থেকেই মানুষেরা এসব জমিতে প্রচুর খাদ্যশস্য ফলাত। তাছাড়া শিকার, মাছধরা এসবও



নীলনদীর সভ্যতা (মিশর)

চলত। নদীউপত্যকা লম্বায় ৮০০ কিমি., চওড়ায় ৫ থেকে ৩২ কিমি.। এরই মধ্যে যত মানুষের ভিড়। খেজুর, ডুমুর ইত্যাদি গাছও যথেষ্ট ছিল। নদী-উপত্যকার কিছু দূরে পাহাড়িয়া অঞ্চলে। সেখানে গ্রানাইট, চুনাপাথর ইত্যাদি যথেষ্ট পাওয়া যেত। ঘরবাড়ি এবং বাঁধ তৈরি করতে এসব গাছ, পাথর সবই ব্যবহার করা হত। কাছাকাছি সোনাও পাওয়া যেত। বন্যার ভয়ে মানুষেরা নদী-উপত্যকার শেষে যেখানে মরুভূমি শুরু হয়েছে, সেখানে ঘর-বাড়ি তৈরি করত—সেরকম জায়গা থেকেই প্রাচীন কালের যাবতীয় ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মিশরের মানুষদের জীবনধারণ নীল-নদীর উপরই নির্ভরশীল। গ্রীকরা যে মিশরকে 'নীলনদীর দান' বলত, সেটা খুবই যথার্থ।

ফেরোদের শাসন—ইউফ্রেটিস বা টাইগ্রিসের তুলনায় নীলনদীর বন্যা ছিল অনেক বেশী প্রচণ্ড। মিশরের দক্ষিণ-অঞ্চলে আসোয়ানে বন্যার জল ১৫ মিটারের বেশী অর্থাৎ চারতলা বাড়ির চেয়েও উঁচু হয়ে উঠত। এই বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হাজার হাজার লোক দরকার। তাই অনেকগুলি ক্ল্যান মিলে ক্রমে ক্রমে বিরাট বিরাট দল তৈরী হল। এগুলির নাম হল 'নোম'। বাইরে থেকে যাযাবর মানুষেরা খাদ্যশস্য লুট করে নিত—তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যেও 'নোম'-এর মত বিরাট দলের দরকার ছিল। নোমের দলপতি খুবই ক্ষমতাশালী হত। বিভিন্ন নোমের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ হত। অবশেষে সমগ্র মিশর দুটি রাজ্যে বিভক্ত হল—উত্তররাজ্য আর দক্ষিণরাজ্য। রাজাদের বলা হত 'ফেরো'। মিশরীয় ভাষায় শব্দটির অর্থ 'যিনি বড় বাড়িতে থাকেন'। ক্রমে এই দুটি রাজ্যের মধ্যেও যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধে জয়ী হয়ে দক্ষিণরাজ্যের ফেরো মেনেস ২৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সমগ্র মিশরের ফেরো হলেন। মিশরে তখন ব্রোঞ্জযুগ শুরু হয়ে গেছে।

৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে একমাত্র সুমেরেই যখন কুড়ি জনের বেশী রাজা রাজত্ব করতেন, সুমেরের চেয়ে অনেক বড় মিশর তখন একজন ফেরোর অধীনে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, ফেরোরা

কিরকম ক্ষমতাশালী ছিলেন। প্রজারা ফেরোকে দেবতা মনে করত। ফেরোরা নিজেও হয়ত তাই মনে করতেন, কেন না তাঁরা সেই ভাবেই চলতেন। ফেরোর প্রধানমন্ত্রীকে 'উজীর' বলা হত। উজীরের অধীনে এক একজন প্রধান ব্যক্তি শাসনের নানা বিভাগ দেখাশোনা করতেন। উজীরের অন্যান্য কাজের মধ্যে ছিল শস্যভাণ্ডার, স্বর্ণাগার, গোশালা, যুদ্ধসংক্রান্ত কাজকর্ম, দেবমন্দিরে বলির কাজ ইত্যাদি দেখাশোনা করা। ফেরোর প্রতিনিধিরূপে তিনি ফেরোর সব কাজকর্ম, অর্থভাণ্ডার, প্রধান বিচারালয় এসবেরও তত্ত্বাবধান করতেন। তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে প্রত্যেক বিভাগে বহু কেরানী ও কর্মচারী থাকত। তারাই সবকিছুর হিসাব রাখত, লেখাজোখার কাজ চালাত।

লেখাজোখা যখন ছিল, তখন নিশ্চয়ই লিপিও ছিল। অনেককাল আগে থেকেই ছবি-আঁকা লিপি ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। সেগুলিকেই উন্নত করে এযুগে যে লিপি ব্যবহার করা হত, তার নাম দেওয়া হয়েছে হায়ারোগ্লিফিক লিপি। প্যাপিরাস নামে এক জাতীয় খাগ পাশাপাশি বেঁধে তার উপর তুলি দিয়ে লেখা হত। এই প্যাপিরাস থেকেই ইংরেজী 'পেপার' শব্দটি এসেছে। বিভিন্ন কৃষকসম্প্রদায় বিভিন্ন জায়গায় চাষবাস করত। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের "বয়োজ্যেষ্ঠদের সমিতি" সম্প্রদায় চালাত। এই সমিতিগুলিই কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করত এবং রাজকোষে জমা



হায়ারোগ্লিফিক লিপি

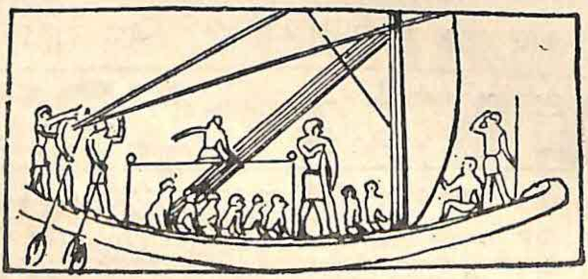
দেবার ব্যবস্থা করত। ফেরোর সভাসদদের ও দেবমন্দিরগুলির নিজস্ব যেসব জমি ছিল, সেগুলিতে মজুরি করতে প্রত্যেক কৃষক

বাধ্য ছিল। এসব কাজের নাম দেওয়া হত 'রাজার কাজ'। বয়োজ্যেষ্ঠদের সমিতিগুলিকেই 'রাজার কাজের' জন্যে লোক যোগাড় করে দিতে হত।

যুদ্ধে যেসব সৈন্য নিয়োগ করা হত, তারা প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকই ছিল। যুদ্ধবন্দীদের এবং ক্রীতদাসদের সৈন্য হিসাবে নিয়োগ করা হত। বিভিন্ন কৃষকসম্প্রদায় থেকেও সৈন্য সংগ্রহ করা হত। দক্ষ মাঝিমাল্লাদের নৌবাহিনীতে নিয়োগ করা হত।

মিশরে পুরোহিতরা মেসোপোটেমিয়ার পুরোহিতদের মত অতটা ক্ষমতাশালী ছিল না। ওখানকার মত কোনো পুরোহিত মিশরে কখনো ফেরো হয়নি। তবে বিভিন্ন নোমের মধ্যে তাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। নানারকম জাদুবিশ্বাস এবং ধর্মবিশ্বাস দিয়ে তারা জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করত। তবে এটাও ঠিক যে, এই পুরোহিতরাই সে-আমলে গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসা এবং অন্যান্য বিদ্যার চর্চা করতেন এবং করাতেন। মাঝে মাঝে পুরোহিতদের সঙ্গে ফেরোর সংঘর্ষ লাগত।

ব্যবসাবাণিজ্য—নীল নদীর জলকে ভালভাবে কাজে লাগানোর ফলে মিশরে প্রচুর খাদ্যশস্য হত। তাই নানারকম কারিগরির কাজে প্রচুর মানুষকে নিযুক্ত করা সম্ভব হত। ফেরোদের প্রাসাদ, বিশেষ

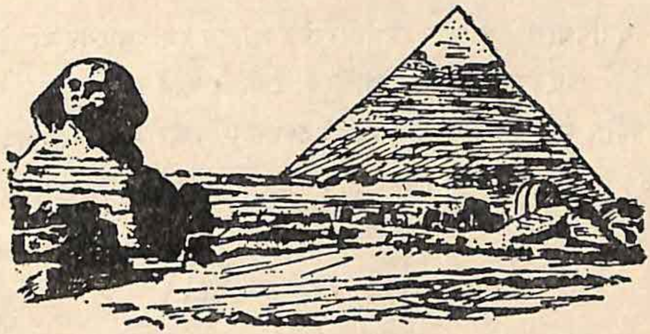


মিশরের জাহাজ (খ্রী. পূ. ২৫০০)

করে তাঁদের সমাধি, ধনীদের বাড়িঘর ইত্যাদি তৈরি এবং সাজানোর কাজে অসংখ্য শ্রমিক, কারিগর ও ক্রীতদাস নিযুক্ত করা হত। কিন্তু বিলাসিতার উপকরণের বেশীর ভাগই মিশরে হত না। তাই বাইরে থেকে আনতে হত। জোর করে কেড়ে আনা ছাড়া, ব্যবসাবাণিজ্যের

মারফতও অন্যান্যদেশ থেকে নানাভাবে এসব উপকরণ যোগাড় করা হত। সিরিয়া থেকে দামী সিডার কাঠ, সাইপ্রাস থেকে তামা, দক্ষিণদিকের নিউবিয়া থেকে সোনা আনা হত। এছাড়াও নানা দেশ থেকে আসত হাতীর দাঁত, সুগন্ধি, রং, দামী পাথর ইত্যাদি। ফিনিসীয় বণিকরাও বড় বড় জাহাজে মিশর এবং অন্যান্য দেশের মধ্যে নানা জিনিসের ব্যবসা করত। বাণিজ্যের ব্যাপারে মিশরীয়দের সঙ্গে ফিনিসীয়দের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

পিরামিড—মিশরের পিরামিড পৃথিবীবিখ্যাত। ফেরোদের বা তাঁদের বিশিষ্ট সভাসদ্‌দের মৃত্যুর পরে মৃতদেহকে 'মমি' করে কফিনের



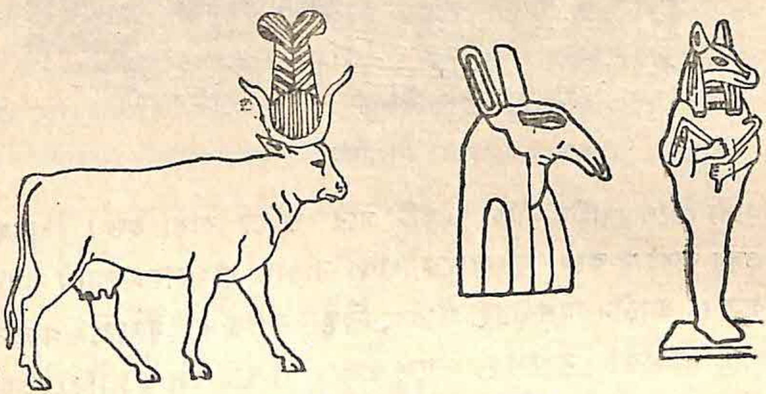
পিরামিড

মধ্যে রেখে মাটির নীচে একটি ঘরে শুইয়ে রাখা হত। সুগন্ধ ওষুধ ব্যবহার করে মৃতদেহকে তাজা রাখার ব্যবস্থাকে 'মমি করা' বলে। প্রাচীন মিশরীয়রা ভাবত, কিছুদিন পর এই মৃতদেহে আবার প্রাণ আসবে। মৃতদেহের পাশে প্রত্যহ খাবার, জল ইত্যাদি দেওয়া হত। তাঁরা বেঁচে থাকার সময় যেসব বিলাসদ্রব্য বা জিনিসপত্র ব্যবহার করতেন, পাশাপাশি ঘরগুলিতে সেগুলিও রাখা হত। তারপর সমাধির উপর পাথর দিয়ে বিরাট স্তূপ গড়া হত। গ্রীক ভাষায় এই স্তূপগুলিকে পিরামিড (অর্থাৎ "খুব উঁচু") বলা হত। ফেরোরা বা সম্ভ্রান্ত লোকেরা নিজেরাই বেঁচে থাকতে থাকতে এসব পিরামিড তৈরি করিয়ে যেতেন।

এ-পর্যন্ত প্রায় আশীটি পিরামিড বা তার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত

হয়েছে। সবচেয়ে যেটি বড় এবং উঁচু, সেটি খ্রীষ্টপূর্ব ২৮০০ সালের কাছাকাছি গিজায় তৈরি হয়েছিল। গিজা হল মিশরের বর্তমান রাজধানী কাইরোর কাছে—নীলনদীর পশ্চিমে। পিরামিডটি 'ফেরো কুফুর পিরামিড' বলে বিখ্যাত। একটি হিসাবে বলা হয়েছে, এর চৌকো ভিতের এক একটি ধার ২২৯ মি. লম্বা, ভিত থেকে মাথা পর্যন্ত ১৪৭ মি. উঁচু, .এবং প্রতিটি ছু টন ওজনের ২৩ লক্ষ পাথরখণ্ড এতে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি তৈরি হতে ২০ বছর লেগেছিল এবং তিন মাস অন্তর ১ লক্ষ গ্রাম্য মানুষকে এটি তৈরির কাজে খাটতে বাধ্য করা হয়েছিল। এ থেকেই বোঝা যায়, ফেরোদের খেয়াল মেটাবার জন্যে গরীব জনসাধারণকে কিভাবে খাটানো হত।

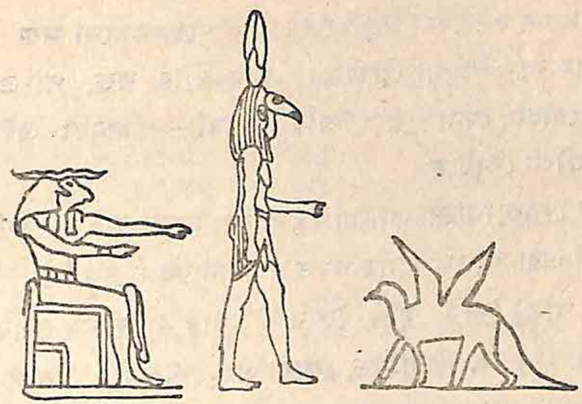
ধর্মবিশ্বাস—প্রাচীন মিশরীয়দের জীবনে ধর্মবিশ্বাসের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। বহুরকম জন্তু বা পাখীকে দেবতা মনে করা হত। প্রাচীন মিশরীয় অনেক দেবদেবীর মুখের চেহারা দেখলেই এটা বোঝা যাবে। উত্তর রাজ্যের রাজধানী মেম্ফিসে বণ্ডরূপী এপিস জনসাধারণের ভক্তি-



প্রাচীন মিশরের কয়েকজন দেবতা

শ্রদ্ধা পেতেন। মহাপ্রতাপান্বিত আকাশ-দেবতা হোরাসের মাথা ছিল বাজপাখীর। বিভিন্ন নোম পশুপাখীর নামে নিজেদের নাম রাখত। যেমন, হরিণ নোম, কুমীর নোম ইত্যাদি। ক্রমে যেসব নোম ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল, তাদের দেবতারাই সারা দেশে বেশী পূজা পেতে লাগল। সূর্য-দেবতা 'রা', বিশ্বস্রষ্টা 'অ্যামন', অথবা উর্বরতার

দেবদেবী ওসাইরিস এবং আইসিস খুবই বিখ্যাত ছিলেন। কৃষি



প্রাচীন মিশরের কয়েকজন দেবতা

শুরুর সময় এবং ফসল কাটবার সময় ওসাইরিস এবং তাঁর স্ত্রী আইসিসের সম্মানে খুব ঘটা করে নাটকের অভিনয় হত।

প্রধান পেশা—মেসোপোটেমিয়ার মতই মিশরে নদী-উপত্যকা জুড়ে ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতার প্রসার ঘটেছিল। অগ্রগতির ধরনও ছিল প্রায় একরকম। তাই সমাজের নানা লোকের পেশার ধরনও প্রায় একরকম ছিল।

পুরোহিতশ্রেণী মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন, জ্ঞানচর্চা করতেন ও শিষ্যসম্প্রদায়কে সেই জ্ঞানে শিক্ষিত করে তুলতেন। অবশ্য পরের দিকে মন্দিরের বাইরেও বিদ্যাচর্চার প্রসার হয়েছিল। পুরোহিতদের অধীনে থাকত তাঁদের কেরানীরা, চিকিৎসকেরা, জাদুকররা, ভক্ত কর্মীরা, কোষাধ্যক্ষ, সরকার, বিভাগীয় কর্তা, কর্মচারী ইত্যাদি নিয়ে বিরাট এক এক গোষ্ঠী। কেননা, মন্দিরের অধীনে অনেক জমিজমা এবং সম্পত্তি থাকত। ফেরোকে ঘিরেও রাজকর্মচারীর বিরাট দল কাজ করত। যথা, উজীর, বিভাগীয় কর্তা, পরামর্শদাতা, হিসাবরক্ষক প্রতিনিধি, দলপতি, প্রহরী, ইত্যাদি। ফেরোর অধীনে যেসব প্রাদেশিক শাসনকর্তা থাকতেন, তাঁদের ঘিরেও যথেষ্ট রাজকর্মচারী থাকত।

দেশের সবচেয়ে বেশী লোক ছিল কৃষক। নানা যুগে এদের নানারকম অবস্থা হয়েছে। কখনো স্বাধীন কৃষক রূপে ফেরোর

খাজনা যুগিয়েছে, কখনো মন্দিরের বা ফেরোর বা ধনীর জন্যে ক্রীতদাসদের মত বিনা মজুরিতে চাষ করেছে, কখনো অন্য লোকের জমি চাষ করে খাজনা দিয়েছে। কৃষি আর শস্য, পরিশ্রম আর দারিদ্র্যমোচন, দেনা শোধ আর দুঃখকষ্ট—প্রধানতঃ এই নিয়েই এদের জীবন কেটেছে।

বহু লোক বিভিন্ন কারিগরির কাজে নিযুক্ত থাকত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এরা অন্যের দাসত্ব করত। নানারকম হস্তশিল্প, ধাতু ও মাটির পাত্র তৈরি, মূর্তি তৈরি ইত্যাদি কাজে বহু লোক নিযুক্ত থাকত। মন্দির, পিরামিড, ফেরো এবং দেবদেবীর বিশাল বিশাল মূর্তি তৈরির কাজেও অসংখ্য কারিগরকে খাটতে হত।

ব্যবসাবাণিজ্য, নৌকা ও জাহাজ চালানো, শিকার, মাছধরা এসব কাজেও অনেক লোক নিযুক্ত থাকত। পরের দিকে বহু লোক বেচা-কেনা এবং দোকানদারিতেও নিযুক্ত থাকত।

সম্ভ্রান্তশ্রেণীর লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পরিবারে প্রচুর দাসদাসীরও প্রয়োজন হত। রাজবাড়ীর তো কথাই নেই। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ক্রীতদাসরাই দাসদাসী হিসাবে নিযুক্ত হত। তাছাড়া ক্রীতদাসদের খেতমজুর হিসাবে, সৈন্য হিসাবে বা যে কোন রকমের পরিশ্রমের কাজে নিযুক্ত করা হত।

এক নজরে

(১) আফ্রিকার উত্তর অঞ্চলে নীল নদীর উর্বর উপত্যকায় মিশরের প্রাচীন সভ্যতার সৃষ্টি। (২) ফেরো মিশরের রাজা—এঁরা খুব ক্ষমতাশালী ছিলেন। মিশরের প্রাচীন প্রচলিত লিপির নাম হায়ারোগ্লিফিক লিপি। বয়োজ্যেষ্ঠদের সমিতি কৃষক সম্প্রদায়গুলি দিয়ে চাষবাস করাত, খাজনা আদায় করত ও জমা দিত। সৈন্যরাও শ্রমিকই ছিল। সমাজের উপর পুরোহিতদের বেশ প্রভাব ছিল। (৩) নানা দেশের সঙ্গে কিছু কিছু বাণিজ্য চলত—বিশেষতঃ ফিনিসীয় বণিকদের মারফত। (৪) ফেরোদের কবরের উপর পাথর দিয়ে পিরামিড তৈরি হত। গিজার পিরামিড সবচেয়ে বড়। (৫) ওসাইরিস, আইসস, রা, অ্যামন ইত্যাদি দেবতা বিখ্যাত ছিল। তাছাড়া বহু দেবতার মুখ ছিল পশুপাখীর মত।

অনুশীলনী

নিবন্ধধর্মী ও ছোটউত্তরধর্মী

১। নীল নদীর উপত্যকায় মিশরীয় সভ্যতার সৃষ্টি হল কেন ?

২। 'ফেরো' কাদের বলা হত ? ফেরোদের ক্ষমতা কেমন ছিল ? ফেরোদের আমলে পুরোহিতশ্রেণী কতটা ক্ষমতাশালী ছিল ?

৩। বয়োজ্যেষ্ঠদের সমিতিগুলি কি কি কাজ করত ?

৪। ব্রোঞ্জযুগে মিশরের ব্যবসাবাণিজ্য কেমন ছিল, সংক্ষেপে লেখ।

৫। পিরামিডের বর্ণনা দাও। একটি পিরামিডের নাম কর।

৬। প্রাচীন মিশরীয়দের ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় দাও।

৭। প্রাচীন মিশরের রাজকর্মচারী ও মন্দিরের কর্মীদের পরিচয় দাও।

৮। প্রাচীন মিশরে সবচেয়ে বেশী লোক কোন্ কাজে নিযুক্ত থাকত ? তাদের অবস্থা বর্ণনা কর।

নৈর্ব্যক্তিক

১। **এক শব্দে উত্তর লেখ :**—মিশরের সবচেয়ে উঁচু পিরামিড কোথায় অবস্থিত ? সুগন্ধ ওষুধ দিয়ে তাজা রাখা মৃতদেহকে কী বলা হয় ? যে জায়গার কাছে নীল নদীর বন্যার জল চারতলা বাড়ির চেয়ে উঁচু হয়ে ওঠে, তার নাম কি ? কোন্ জাতীয় বণিকদের সঙ্গে মিশরের ব্যবসাবাণিজ্যের নিবিড় সম্পর্ক ছিল ? প্রাচীন মিশরীয় লিপির নাম কি ?

২। **শূন্যস্থান পূরণ কর :**—কৃষির দেবতার নাম ছিল—এবং—। গিজার পিরামিড ফেরো—র পিরামিড রূপে বিখ্যাত। হায়ারোগ্লিফিক লিপি—দিয়ে লেখা হত—নামে একজাতীয় খাগের উপর। —মিশরের নাম দিয়েছিল 'নীল নদীর দান'। মিশরে নীল নদীর উপত্যকা লম্বায়—কিমি., চওড়ায় ৫ থেকে —কিমি.।

৩। **যার সঙ্গে যেটি মেলে, লাইন টেনে যোগ কর :**

হাপি	ফেরো
ফিনিসীয়	প্রধানমন্ত্রী
রাজা	নদী
উজীর	বণিক

হাতের কাজ

শিক্ষকমহাশয়ের পরামর্শ নিয়ে

১। মাটি বা প্লাষ্টার দিয়ে মিশরের নীল নদীর উপত্যকার মডেল তৈরি কর।

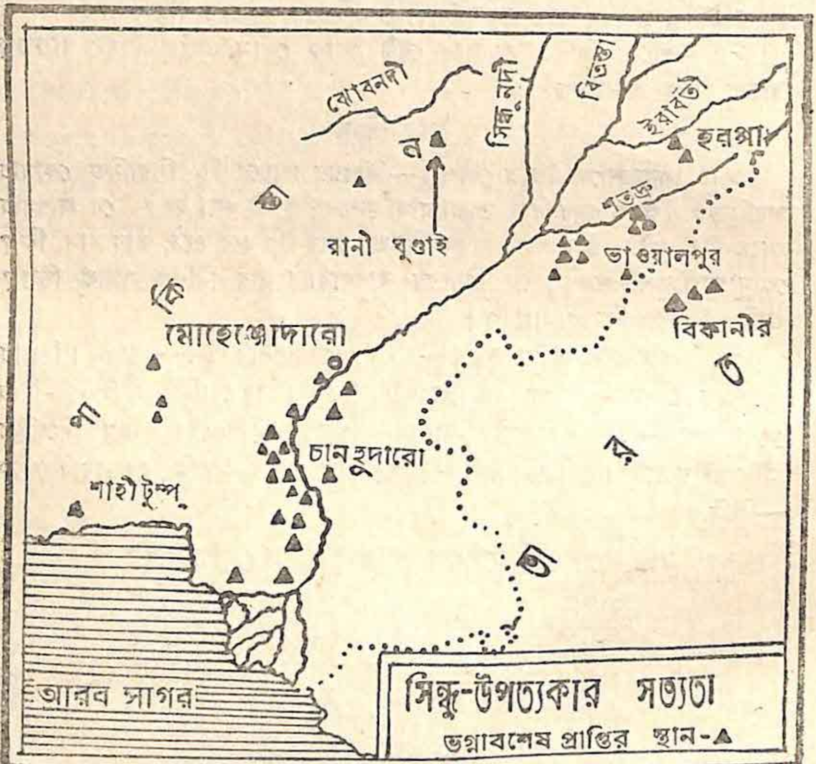
২। নানা রং ব্যবহার করে মিশরের মানচিত্র এঁকে তাতে নীল নদীর উপত্যকা এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্থান দেখাও। উপত্যকায় সবুজ রং দেবে। পাহাড়িয়া অঞ্চলে হলুদ রং দেবে, মরু অঞ্চল সাদা রাখবে।

৩। একখানি তক্তায় পিরামিডের মডেল তৈরি কর।

(৩) সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা

তামাব্রোঞ্জ যুগের আর এক বিস্তৃত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ভারতবর্ষের পশ্চিম অঞ্চলে। ইতিহাসে এই নগরসভ্যতা 'সিন্ধু-উপত্যকার' সভ্যতা নামে বিখ্যাত। আধুনিক বহু পণ্ডিত মনে করেন, এই সভ্যতা সুমের-সভ্যতার চেয়েও প্রাচীন। অন্যেরা মনে করেন, সুমের-সভ্যতা ও এই সভ্যতা একই কালের।

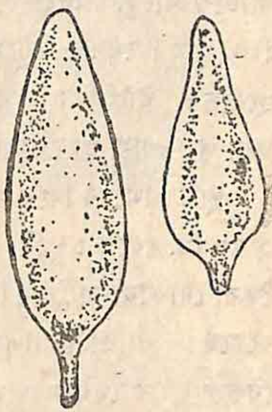
আবিষ্কার—ভারতবর্ষের পশ্চিমদিকে এখন পাকিস্তান দেশের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এখানে নানা জায়গায় বহুদিন ধরে সুপ্রাচীন কালের



নানারকম ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হচ্ছিল। সেগুলি থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ বছর নাগাদ এই অঞ্চলে ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। যে দুটি স্থানে উন্নত নগরসভ্যতার বিপুল নিদর্শন পাওয়া গেছে, সেই দুটি স্থানের নাম হরপ্পা এবং মোহেনজোদারো। পাকিস্তানের মন্টগোমারি জেলায় সিন্ধুনদীর উপনদী ইরাবতীর ধারে

হরপ্পা। আর পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় সিন্ধুনদীর কাছাকাছি মোহেন্‌জোদারো। এই দুটি স্থানে মাটি খুঁড়ে প্রাচীন যুগের দুটি শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। হরপ্পা থেকে মোহেন্‌জোদারো প্রায় ৫৫০ কিমি. দক্ষিণ-পশ্চিমে। সিন্ধী ভাষায় মোহেন্‌জোদারো শব্দের অর্থ 'মৃতের স্তূপ' বা 'মৃতের পুরী'। হরপ্পার কথা গত শতাব্দীতে কিছুটা জানা গিয়েছিল, তবে খোঁড়াখুঁড়ি বিশেষ হয়নি। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯১৭ থেকে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মোহেন্‌জোদারো শহরটি আবিষ্কার করেন। হরপ্পার শহরটি তার কয়েক বছর পরে আবিষ্কার করা হয়।

মাটি খুঁড়ে এই শহর দুটিতে ব্রোঞ্জযুগের নগরসভ্যতার প্রচুর জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ পোড়ানো ইটে তৈরী ঘরবাড়ী, রাস্তা-ঘাট, পোড়ামাটির জিনিস, গৃহস্থালী জিনিস, খেলনা, ব্রোঞ্জের হাতিয়ার, দেবদেবীর মূর্তি, মন্দির, স্নানাগার, ড্রেন, বিভিন্ন পশুপাখীর মূর্তি ইত্যাদি অজস্র জিনিস পাওয়া গেছে। ১৯৫০ সালে মোহেন্‌জোদারোতে একটি বিরাট শস্যভাণ্ডারও খুঁজে পাওয়া গেছে। আরো বহু স্থানে খননের ফলে যেসব জিনিস পাওয়া গেছে, সেগুলির সঙ্গে মোহেন্‌জোদারো-হরপ্পায় পাওয়া জিনিসের হুবহু মিল। এ থেকে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, সাধারণভাবে এই উন্নত সভ্যতা 'সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা' নামে প্রচারিত হলেও গুজরাট থেকে উত্তরপ্রদেশে গঙ্গানদীর উপত্যকা পর্যন্ত এর বিস্তার হয়েছিল, এবং এটাই ছিল ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা।



ব্রোঞ্জের গৃহস্থালীর-হাতিয়ার

শহর-পরিকল্পনা—কৃষি এবং অরণ্যসম্পদের উপর নির্ভর করেই এই শহর দুটির উন্নতি হয়েছিল। দুটি শহরেরই মাঝখানে ছিল আয়তাকার নগরদুর্গ। দুর্গের মোটামুটি মাপ দৈর্ঘ্যে ৩৬৫মি., প্রস্থে ১৮২মি.। ৯০মি. উঁচু ভিতের উপর দুর্গ তৈরি হয়েছে। দুর্গের চারপাশে

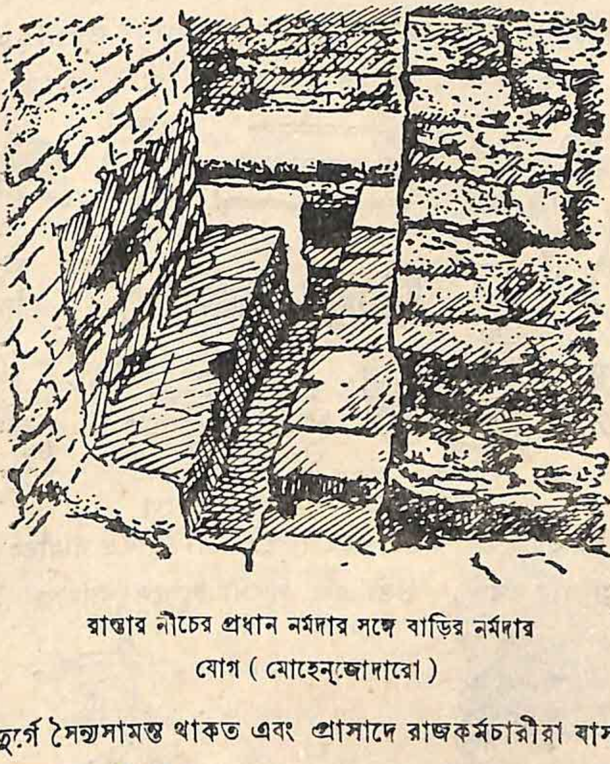
সুবিশাল সিংহদ্বার। দুর্গের নীচের চারদিকে বিস্তৃত হয়েছে শহর। যেসব প্রধান বাড়িঘরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, সেগুলি হল :— (১) ৭০ মি.×২৪ মি. মাপের একটি বাড়ি, তার চারদিকে অনেক ঘর —অনেকটা কলেজের মত ; (২) প্রায় ২৭মি.×২৭মি. মাপের একটি থামওয়ালা হলঘর—সম্ভবতঃ নগরপ্রধানদের সভাঘর ; (৩) প্রায় ৩৩ মি.×৩৩ মি. মাপের স্নানাগার। এর পাশে চৌকো একটি জায়গার তিনদিকে পোশাক বদলানোর জন্যে ঘর। মাঝখানে মোটামুটি ১২মি. ×৭ মি. মাপের একটি স্নানের জায়গা—তার গভীরতা প্রায় তিন মিটার। কাছের কূপ থেকে পরিষ্কার জল এই স্নানের জায়গাটিতে ঢোকবার এবং অপরিষ্কার জল বাইরে বার করবার সুবন্দোবস্ত ছিল। স্নানাগারের উপরের তলায়ও ঘর ছিল। স্নানের জায়গায় যাতে জল আটকে থাকে, সেজন্যে পুরু করে ইট গাঁথা হয়েছে। ইট গাঁথা হয়েছে জিপ্‌সাম দিয়ে ;—বিটুমেনের আস্তর লাগিয়ে জলনিরোধের ব্যবস্থা হয়েছে। ইটগুলির মাপ লম্বা এবং চওড়ায় এখনকার ইটের দ্বিগুণ, তবে পুরু প্রায় একরকম।

দুর্গের নিচের দিকে লম্বা লম্বা রাস্তা চলে গেছে। রাস্তাগুলি ২·৭৩ মি. থেকে ১০ মি. পর্যন্ত চওড়া। রাস্তার ধারে ধারে ইটের তৈরী দোকান, বাড়িঘর। শ্রমিকদের জন্যে আলাদা ১৬টি ঘরের সারি রয়েছে। প্রতিটির মাপ প্রায় ৭ মি.×৭ মি.। প্রতিটি ঘর দুভাগে বিভক্ত। কাছেই ময়দার কারখানা। কারখানার গোলাকার ইট-বাঁধানো জায়গায় গম থেকে ময়দা তৈরির ব্যবস্থা।

সরকারী শস্যভাণ্ডারটিও বিরাট—প্রায় ৬০ মি.×৪৫·৫ মি.। এটি ১৫ মি.×৬ মি. মাপের কয়েকটি ঘরে বিভক্ত।

নগরের বড় রাস্তাগুলি থেকে ছোট ছোট গলি বার হয়ে পাড়ার মধ্যে চলে গেছে। পাড়ায় পাড়ায় একতলা-দোতলা বাড়ি। ঘরে দরজা-জানালা—দরজা জানালায় চৌকাঠের ব্যবস্থা। বাড়িগুলির মধ্যেও স্নানঘর রয়েছে—স্নানঘরের মেঝে এখনও ঝকঝকে, পরিষ্কার। জলের জন্যে বহু জায়গায় পাতকুয়া রয়েছে। বাড়িগুলি থেকে ময়লা জল বেরোবার নর্দমাগুলি এসে বড় নর্দমায় পড়ত।

রাস্তার পাশে মাটির নিচে থাকত বড় নর্দমা। বড় নর্দমা দিয়ে ময়লা জল গিয়ে পড়ত অন্য কুণ্ডে। সাধারণ লোকের জন্যেও স্নানাগার ছিল। বড় বড় বাড়ির সঙ্গে দারোয়ানের ঘর, অতিথিশালা, রান্নাঘর ইত্যাদির চিহ্নও পাওয়া গেছে। নগররক্ষার



রাস্তার নীচের প্রধান নর্মদার সঙ্গে বাড়ির নর্মদার যোগ (মোহেন্‌জোদারো)

জন্যে দুর্গে সৈন্যসামন্ত থাকত এবং প্রাসাদে রাজকর্মচারীরা বাস করত বলে অনুমান করা হয়।

খাদ্য—সিন্ধুসভ্যতার যুগে প্রধান খাদ্য ছিল গম, বার্লি, খেজুর প্রভৃতি। নানারকম ফলও খাওয়া হত। এছাড়া, গরু, শুয়ার, ভেড়া, হাঁস, ঘুঘু, কচ্ছপ প্রভৃতির মাংস এবং দুধ, শুকনো মাছ, টাটকা মাছ ইত্যাদিও খাওয়া হত।

অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস—গৃহস্থালী ও নানা কাজে এই যুগের লোকেরা যেসব জিনিস ব্যবহার করত, তার অজস্র নিদর্শন এই নগর দুটির মধ্যে পাওয়া গেছে। তার মধ্যে রয়েছে নানারকম মাটির-ভাঁড়, ব্রোঞ্জ এবং পিতলের নানা ধরনের পাত্র, গোল আরশি, ঢাকনি,

মালসা, হাঁড়ি, কলসী, সরা, কড়াই, গামলা, রেকাবি, থালা, বাটি, জালা, ধুনুচি, প্রদীপ, ঘট, গাড়ু ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস। নানা কাজে ব্যবহারের উপযোগী সরু ও লম্বা কুড়াল, তিনকোণা ছোরা, বাটালি, করাত, কাস্তে, বেধনী, স্মূচ ইত্যাদিও পাওয়া গেছে। বর্শা, ছোরা, তীর, তীরের ফলা, ছোট চওড়া কুড়াল, তরবারি এসবও পাওয়া গেছে—এগুলি নিশ্চয়ই যুদ্ধে ব্যবহৃত হত। প্রধানতঃ ব্রোঞ্জ



সিন্ধু-সভ্যতার মাটির পাত্রের টুকরো

দিয়েই হাতিয়ার তৈরি হত, তবে পাথরের হাতিয়ারও সাধারণ লোক যথেষ্ট ব্যবহার করত। স্মৃতী এবং পশমী কাপড়ের সামান্য নিদর্শন

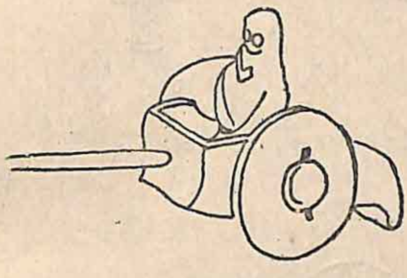


সিন্ধুসভ্যতার অলঙ্কারের নিদর্শন (সোনা ও দামী পাথরের)

পাওয়া গেছে। তবে অলঙ্কারের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গেছে। কান-পাশা, নাকছাবি, হার, কোমরবন্ধ মেয়েরাই ব্যবহার করত। সোনা,

রূপা, ব্রোঞ্জ, তামা ইত্যাদি ধাতু দিয়ে অলঙ্কার তৈরি হত। অলঙ্কারে হাতির দাঁত এবং মূল্যবান পাথরও ব্যবহৃত হত।

এছাড়া যান-বাহনের অনেক চাকা পাওয়া গেছে। তাছাড়া পাওয়া গেছে পোড়ামাটি অথবা সাজিমাটি দিয়ে তৈরী অনেক সীলমোহর। সীলমোহরগুলি সম্ভবতঃ ব্যবসা বাণিজ্যের কাজে ব্যবহৃত হত।



সিন্ধুসভ্যতার গাড়ি

শিল্পকর্ম—শিল্পকর্মের বহু নিদর্শন থেকে বোঝা যায়, নানা জিনিস উৎপাদনে এই সভ্যতার মানুষেরা উন্নতি লাভ করেছিল। সুতোকাটার এবং কাপড় বোনার কাজ এযুগে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। তুলোর চাষ হত, সুতরাং সুতো কাটার জন্যে তুলোর অভাব হত না। পশমী ও সুতী পোশাক তৈরি হত। পোড়ামাটি দিয়ে নানারকম গৃহস্থালী জিনিস এবং সীলমোহর তৈরি হত। এসব জিনিসে প্রায়ই সুন্দরভাবে রং দিয়ে লতাপাতা, গাছ, পশুপাখী ইত্যাদির ছবি আঁকা হত। মাটির পাত্র তৈরি করবার জন্যে কুমোরের চাক ব্যবহৃত হত। পাথরের হাতিয়ার ছাড়াও, তামা এবং ব্রোঞ্জ দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হত। পাত্র, অলঙ্কার এবং হাতিয়ার তৈরিতে যেসব ধাতু ব্যবহৃত হত, তার মধ্যে ছিল তামা, ব্রোঞ্জ, টিন, সীসা, সোনা ও রুপো। পোড়ামাটি দিয়ে সেযুগে নানারকমের বেলুন ও কাজের জিনিস তৈরি হত। গম থেকে ময়দা তৈরির কারখানা ছিল।



মাটির পাত্রে ছবি
(সিন্ধুসভ্যতা)

চারুকলায়ও এযুগের মানুষের কিরকম দক্ষতা ছিল, তা মোহেন্‌জোদারো এবং হরপ্পায় পাওয়া নানা ধরনের অলঙ্কার এবং অন্যান্য জিনিস থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। মেয়েদের ও পুরুষদের

জন্য নানা ধরনের শৌখিন অলঙ্কার তৈরি হত। পাথর ও ব্রোঞ্জ

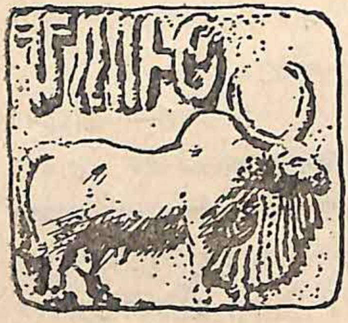


শিকারের ছবি



ক্রশ

দিয়ে তৈরী অনেকগুলি মূর্তিও পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে ধ্যানমগ্ন



সীলমোহর



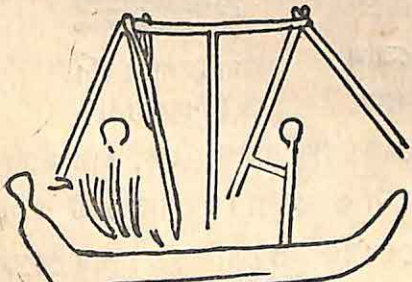
খেলনা



সীলমোহর

যোগীর একটি মূর্তি, নৃত্যরত একটি তরুণীর মূর্তি, অনেকটা নজরাজের ভঙ্গিতে নাচছে এমন এক পুরুষের মূর্তি বিখ্যাত।

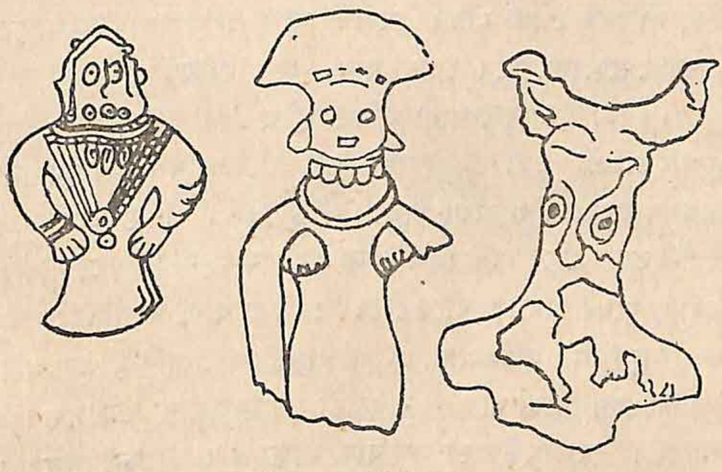
ব্যবসাবাণিজ্য—ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এই যুগের মানুষ পিছিয়ে ছিল না। ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলের সঙ্গে এবং এসিয়ার অন্যান্য দেশ, যথা, মেসোপোটেমিয়া, আফগানিস্তান, মধ্য-এসিয়া, পারস্য প্রভৃতি দেশের সঙ্গেও তারা ব্যবসাবাণিজ্য করত। মেসোপোটেমিয়ায় সিন্ধু-সভ্যতার নানা নিদর্শন এবং সীলমোহর পাওয়া গেছে। স্থল ও জল দুই পথেই বাণিজ্য চলত। দুটি সীলমোহরে নৌকার ছবি পাওয়া গেছে। ভারতবর্ষের নানা অঞ্চল ছাড়াও বাইরের



নৌকার ছবি (সিন্ধু সভ্যতা)

নানা দেশ থেকে নানা ধাতু আমদানি করা হত। ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, নর্দমা ইত্যাদি তৈরির জন্যে নানা জায়গা থেকে নানারকম রাসায়নিক ও খনিজদ্রব্য আনা হত। হরপ্পা-মোহেন্‌জোদারো থেকে সুমের ও অন্যত্র প্রধানতঃ রপ্তানি হত তুলোর তৈরী কাপড়চোপড়, পাথরের জিনিস, ছবি-আঁকা মাটির পাত্র ইত্যাদি।

ধর্মবিশ্বাস—সীলমোহরের ছবি এবং নানা রকম মূর্তি থেকে সিন্ধুসভ্যতার যুগের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যায়।



দেবীমূর্তি বা মাতৃমূর্তি (সিন্ধুসভ্যতা)

অনেকে মনে করেন, এ-যুগের মানুষ মাতৃমূর্তির উপাসনা করত। যোগাসনে উপবিষ্ট পশুপতির ছবি দেখে মনে হয়, শিবপূজাও প্রচলিত ছিল। শিবলিঙ্গের মূর্তিও অনেক পাওয়া গেছে। এছাড়া, গাছ এবং নানাপ্রকার জীবজন্তুর উপাসনা বোধহয় প্রচলিত ছিল। সাপ এবং নানা জলদেবতারও পূজা হত।



পশুপতির (শিবের) মূর্তি আঁকা সীলমোহর

সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী—কিছু কিছু সীলমোহরে নানারকম লেখা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই লিপি আজো পড়া যায় নি।

পড়া গেলে এবং ওসব লেখার মানে বোঝা গেলে, সিন্ধুসভ্যতার যুগের সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে হয়ত অনেক কিছু জানা যেত। তবে যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে এবং বাড়িঘরের যে পার্থক্য দেখা গেছে, তাতে বেশ বোঝা যায়, সমাজে ধনী এবং দরিদ্র দুই শ্রেণীই ছিল। প্রাসাদ, দুর্গ, বড় বাড়ী ইত্যাদি থেকে বোঝা যায়, ধনী শ্রেণী নিশ্চয়ই ছিল। আবার ময়দার কারখানার কাছে শ্রমিকদের জন্যে যেসব ঘর ছিল, সেগুলি যে ক্রীতদাসজাতীয় অতিদরিদ্রশ্রেণীর মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। শহরের মধ্যে ধাতু গলাবার যে চুল্লী পাওয়া গেছে, তা দেখে বোঝা যায়, এতে দরিদ্র শ্রমিকরাই কাজ করত। নির্দিষ্টভাবে কোনো মন্দির খুঁজে পাওয়া যায় নি; তাই পুরোহিতশ্রেণী কতটা ক্ষমতাশালী ছিল তা বোঝা যায় না। দুর্গ দেখে বোঝা যায়, রাজা বা রাজা-জাতীয় ব্যক্তি ছিল। কিন্তু তাঁর ক্ষমতা পুরোহিতদের চেয়ে বেশী ছিল কিনা বলা যায় না। তবে সাধারণ ঘরবাড়ি যথেষ্ট সংখ্যায় আছে দেখে মনে করা যায়, মধ্যবিত্ত লোকও বেশ কিছু ছিল। মাঝিমাল্লা, জেলে, ব্যাধ, কৃষক, শ্রমিক, এরা গরীব ছিল তা বেশ বোঝা যায়। ব্যবসায়ী শ্রেণীরও বেশ প্রতিপত্তি ছিল মনে হয়। মোটামুটিভাবে বলা যায়, হরপ্পা এবং মোহেন্‌জোদারোতে মানুষ ধনী ও দরিদ্র প্রধানতঃ এই দুই শ্রেণীতেই বিভক্ত ছিল। পুরোহিত, মধ্যবিত্ত, বণিক ইত্যাদির অবস্থা হয়ত সাধারণের চেয়ে কিছুটা ভাল ছিল। দরিদ্র জনসাধারণ শস্য এবং নানা জিনিস উৎপাদন করবার কাজে নিযুক্ত থেকে দরিদ্রই থাকত, আর তাদের উৎপাদিত শস্য এবং পণ্যে বিনা পরিশ্রমে ভাগ বসিয়ে বেশ কিছু লোক আরামে ও বিলাসে দিন কাটাত।

এক নজরে

(ক) হরপ্পা ও মোহেন্‌জোদারোতে ব্রোঞ্জযুগের নগর আবিষ্কৃত হয়েছে; (২) নগরে দুর্গ, স্নানাগার, রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, নর্দমা, দোকান ইত্যাদি ছিল। (৩) মানুষেরা গম, বার্লি, ফল, পশুপাখীর মাংস ইত্যাদি খেত। (৪) পোড়া মাটির ও ধাতুর তৈরী নানাপ্রকার গৃহস্থালী জিনিস, পাথর ও ব্রোঞ্জের নানাপ্রকার হাতিয়ার, বহু সীলমোহর ও মূর্তি পাওয়া গেছে। (৫) বহু প্রকার হস্তশিল্প ও চারুকলার নিদর্শন পাওয়া গেছে। (৬) ভারতের নানা অঞ্চল এবং

বিদেশের সঙ্গে স্থল ও জলপথে বাণিজ্য হত। (৭) মাতৃমূর্তি, পশুপতি, গাছ ও নানা জীবজন্তুর পূজা হত। (৮) ধনী ও দরিদ্র, এই দুই প্রধান শ্রেণী বাস করত।

অনুশীলনী

নৈর্ব্যক্তিক

১। **শুদ্ধ হলে ✓ চিহ্ন দাও**—পাকিস্তান আগে ভারতবর্ষের মধ্যে ছিল। হরপ্পা সিন্ধুনদীর তীরে। হরপ্পা আর মোহেন্‌জোদারো ব্রোঞ্জযুগের শহর। মোহেন্‌জোদারোয় অনেক পাথরের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। পারস্যের সঙ্গেও হরপ্পার বাণিজ্য চলত।

২। **হ্যাঁ না বল**ঃ—মোহেন্‌জোদারোর লোকেরা কি মাংস খেত? সিন্ধুউপত্যকার সভ্যতায় কি লিপির প্রচলন ছিল? হরপ্পা কি ইরাবতী নদীর কাছে? সিন্ধুসভ্যতার লোকেরা কি জীবজন্তু পূজা করত?

৩। **শুদ্ধ উত্তরটি ছাড়া বাকিগুলি কেটে দাও**ঃ—মোহেন্‌জোদারোর সভ্যতা প্রত্নপ্রস্তর / নব্যপ্রস্তর / ব্রোঞ্জযুগের। হরপ্পার দুর্গটি ছিল শহরের একপাশে / নীচে / মাঝখানে। সিন্ধুউপত্যকার শহর দুটির সঙ্গে ইউরোপ / ব্রহ্মদেশ / মেসোপোটেমিয়ার বাণিজ্য চলত।

নিবন্ধধর্মী ও ছোটউত্তরধর্মী

১। সিন্ধুউপত্যকার নগরসভ্যতার প্রমাণ কোথায় পাওয়া গেছে?
২। সিন্ধুউপত্যকার প্রাচীন নগরদুটির পরিকল্পনা বর্ণনা কর।
৩। মোহেন্‌জোদারোতে কী ধরনের গৃহস্থালী জিনিস পাওয়া গেছে।
৪। সিন্ধুসভ্যতার মানুষেরা কি কি খেত?
৫। সিন্ধুসভ্যতার যুগের হাতিয়ারগুলির বিবরণ দাও।
৬। সিন্ধুসভ্যতার হস্তশিল্প ও চারুকলার বিবরণ দাও।
৭। সিন্ধুসভ্যতার মানুষের ধর্মবিশ্বাসের কি পরিচয় পাওয়া যায়?
৮। মোহেন্‌জোদারোতে কি কি শ্রেণীর লোক বাস করত?
৯। হরপ্পা ও মোহেন্‌জোদারোর ব্যবসাবাণিজ্যের পরিচয় দাও।

হাতের কাজ

শিক্ষকমহাশয়ের পরামর্শ নিয়ে

১। মোহেন্‌জোদারোর একটি মডেল বানাও।

২। বাঁখারি, কঞ্চি, পিসবোর্ড, রং ইত্যাদি ব্যবহার করে সিন্ধুসভ্যতার যুগের কয়েকটি হাতিয়ারের নমুনা বানাও।

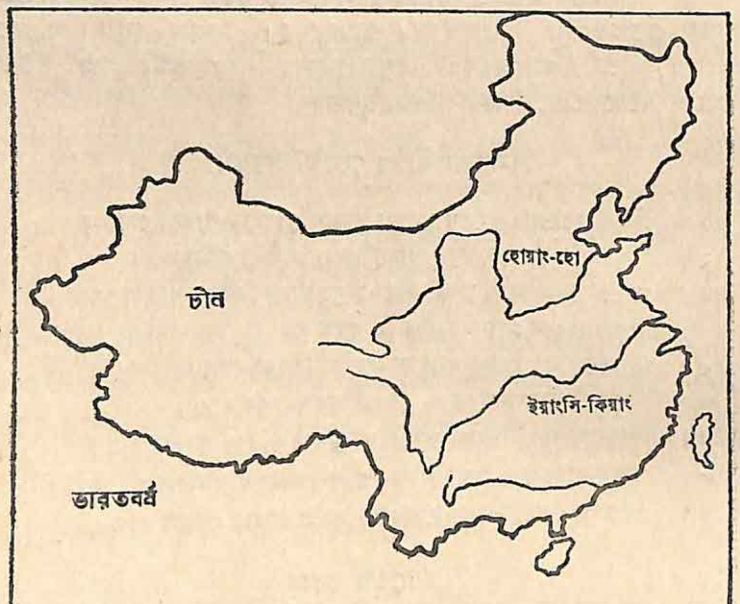
৩। পশ্চিমভারতের মানচিত্র এঁকে সিন্ধু ও তার উপনদীগুলি দেখাও। হরপ্পা এবং মোহেন্‌জোদারো গোল দাগ এঁকে দেখাও।

(৪) চীন

নদী-উপত্যকার সভ্যতা—মেসোপোটেমিয়া, মিশর এবং সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার কিছুকাল পরে আনুমানিক ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ চীনের অন্তত দুটি অঞ্চলে ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

এই অঞ্চল দুটিও নদীর উপত্যকা। একটি হল চীনের উত্তর অঞ্চলের হোয়াং-হো নদী (হলুদ নদী)। অপরটি হল দক্ষিণ অঞ্চলের ইয়াংসি-কিয়াং। পণ্ডিতেরা বলছেন, উত্তর অঞ্চলের সভ্যতাই পরে দক্ষিণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রাচীন চীন—চীনে মাটি খুঁড়ে প্রাচীন সভ্যতা অনুসন্ধানের কাজ খুব বেশী হয় নি। ৩/৪ লক্ষ বছর আগেকার 'পিকিং মানুষের' কথা জানবার পর যেসব মানুষের বসতি খুঁজে পাওয়া গেছে, তারা প্রায়



চীনের সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতার অঞ্চল

পঁচিশ হাজার বছর আগের। তারপরই পাওয়া গেল হোয়াং-হোর উপত্যকায় নব্যপ্রস্তরযুগের বসতি। এইসব বসতি প্রায় ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকেই শুরু হয়েছিল। এ-যুগের মানুষেরা চাষবাসের উপরই নির্ভর করত, তবে পশুপালনও জানত। কৃষিকাজের উপর

নির্ভরশীল বহু ছোট ছোট গ্রামের খোঁজ পাওয়া গেছে। এসব গ্রামের মানুষেরা ছুতোরের কাজ, তাঁতের কাজ, মাটির পাত্র তৈরির কাজও জানত। তবে কুমোরের চাক বোধহয় ছিল না। ইয়াংসি-কিয়াং-এর উপত্যকায়ও এরকম বসতি খুঁজে পাওয়া গেছে—তবে কিছুটা পরবর্তীকালের। পাথরের যেসব হাতিয়ার পাওয়া গেছে, সেগুলির অধিকাংশই বোধহয় লাঙলের ফলা হিসাবে ব্যবহৃত হত।

উত্তর চীনে নব্যপ্রস্তরযুগের সবচেয়ে বড় বসতিটি পাওয়া গেছে ইয়াংশাও নামক স্থানে। এটি ২৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কিছু আগের। এখানকার মানুষেরা জোয়ার ও ধান চাষ করত। এরা কুকুর, শুয়ার, ভেড়া ও গরু পালন করত, মাটির পাত্রে রং দিয়ে ছবি আঁকত। চীনের উত্তরপূর্ব অঞ্চলের 'লুংশান্'-এ আরো কিছুকাল পরের মনুষ্যবসতি পাওয়া গেছে। এই জায়গায় কুমোরের চাক ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাছাড়া, প্রধান প্রধান গ্রামগুলির উপর নির্ভর করে কয়েকটি ছোটখাটো নগরও এই অঞ্চল গড়ে উঠেছিল।

এই বসতিগুলির কোনোটিতেই ধাতু ব্যবহারের কোনো চিহ্ন চোখে পড়ে নি। কিন্তু ১৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ চীনে ব্রোঞ্জের প্রচুর ব্যবহার হত, এর প্রমাণ পাওয়া গেছে।

পৌরাণিক কাহিনী—চীনে যেসব পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত, তাতে প্রাচীন চীন সম্পর্কে নানা কাহিনী রয়েছে। সেগুলি অনুসারে চীনে আগুনের আবিষ্কার হবার পর, শিকার ও পশুপালনের প্রচলন হয়। এরও পরে চাষবাসের পদ্ধতি এবং নানা গাছগাছড়ার সাহায্যে চিকিৎসার আবিষ্কার হয়। এর পর হুয়াং-টি নামে এক সম্রাট চীনের বিভিন্ন অঞ্চল জয় করে ঘরবাড়ি ও নগর তৈরির সূত্রপাত করেন। এঁর পত্নী চীনে রেশম-বোনার প্রচলন করেছিলেন। এরপর চীনে তিনজন বড়বড় সম্রাট রাজত্ব করেন। তাঁদের মধ্যে সম্রাট ইউ বন্যা-নিয়ন্ত্রণে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখান। সম্রাট ইউ হোয়াং-হো নদীর নানা স্থানে বাঁধ দিয়ে বন্যা রোধের ব্যবস্থা করেন। স্থানে স্থানে বিশাল জলাধার তৈরি করে এবং বহু খাল কেটে শস্যক্ষেত্রে জলসেচের ব্যবস্থার সূত্রপাত তিনিই করেন। এঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ প্রায়

পাঁচশ বছর টিকে ছিল। সেই বংশের অত্যাচারী শেষ রাজাকে হত্যা করে টাং নামে এক রাজা "শাং রাজবংশ" প্রতিষ্ঠা করেন।

এইসব কাহিনীতে প্রাচীন চীনের একটা পরপর বিবরণ পাওয়া গেলেও, এগুলি যে সত্য, তা প্রমাণ করবার মত নিদর্শন পাওয়া যায় নি। তবে খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ বছর নাগাদ শাং রাজবংশ রাজত্ব করত, এটা সত্য। এই সময় চীনে পুরো মাত্রায় ব্রোঞ্জযুগ চলছে।

এক নজরে (১) সিন্ধু-সভ্যতার কিছু পরে চীনের হোয়াং-হো এবং ইয়াংসি-কিয়াং নদীর উপত্যকায়ও নগরসভ্যতার শুরু হয়েছিল। (২) ইয়াংশাও, লুংশান এবং আরো বহুস্থানে নব্যপ্রস্তরযুগের কৃষিনির্ভর সভ্যতা ছিল। অনেক ছোটখাটো শহরও ছিল। (৩) চীনের সভ্যতা সম্পর্কে নানা পৌরাণিক কাহিনীও আছে, তবে সেগুলি সত্য কিনা তার প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

অনুশীলনী

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। **এক কথায় উত্তর দাও:**—চীনের নগরসভ্যতা সিন্ধুসভ্যতার আগের না পরের? কোন্ নদীর উপত্যকার চীনে প্রথম নগরসভ্যতার সৃষ্টি হয়? চীনের দক্ষিণ অঞ্চলের কোন্ নদীর উপত্যকায় নগরসভ্যতা প্রথম গড়ে উঠেছিল?'

নিবন্ধধর্মী ও ছোটউত্তরধর্মী

১। চীনের প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীতে সভ্যতাবিস্তারের কেমন কাহিনী পাওয়া যায়? এগুলি কি সত্য?

২। চীনের যে অঞ্চলে প্রথম নব্যপ্রস্তরযুগের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তার পরিচয় দাও। এই সভ্যতা কত প্রাচীন?

৩। চীনের নব্যপ্রস্তরযুগের সভ্যতা সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

হাতের কাজ

১। চীনের মানচিত্র এঁকে হোয়াং-হো এবং ইয়াংসি-কিয়াং নদী দেখাও।

---

(৫) নদী-উপত্যকার সভ্যতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য

৩০০০ থেকে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে যে চারটি প্রধান সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তার সবকটির মধ্যে অনেকগুলি ব্যাপারে মিল দেখা যায়। এই মিলগুলিই হল সেইসব সভ্যতার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। নীচে সেই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে বলা হল।

(ক) **নদীউপত্যকার সমভূমিতে জন্ম**—মেসোপোটেমিয়া, মিশর, ভারত ও চীন, এই চারটি অঞ্চলেই দেখা গেছে যে, নদী-উপত্যকাকে ঘিরেই প্রথম সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষতঃ, নদী যেখানে সমভূমির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং প্রতি বছর বন্যা ঘটাচ্ছে, সেখানেই প্রাচীন মানুষ প্রথম সভ্যতা স্থাপন করেছে।

(খ) **ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতা**—প্রধানতঃ ব্রোঞ্জযুগেই প্রধান নগর-সভ্যতাগুলি দৃঢ়ভাবে গড়ে উঠেছিল। চীনে ব্রোঞ্জযুগ দেরিতে এসেছে, তাই ওখানে অন্যান্য সভ্যতাগুলির তুলনায় দেরিতে দৃঢ় নগরসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(গ) **সভ্যতার মূলে বন্যানিয়ন্ত্রণ**—বন্যার জল থিতিয়ে এলে সে-যুগের মানুষ চাষবাস করে প্রচুর ফসল পেত। কিন্তু বন্যার জলে মানুষের বসতি ভেসে যেত। তাই মানুষেরা নদীতে বাঁধ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করল, জলাধার থেকে খাল কেটে বহুদূর পর্যন্ত শস্য-ক্ষেত্রে জেলেসেচের ব্যবস্থা করল। এসব কাজের জন্য প্রচুর লোক দরকার। প্রচুর লোক একসঙ্গে থাকতে শুরু করল, পশুপালন করতে লাগল, দরকারের চেয়েও বেশী ফসল পাওয়ায় অন্যান্য কাজকর্ম করবার সুযোগ পেল। এভাবে ধীরে ধীরে নগর গড়ে উঠল।

(ঘ) **শিল্পকর্ম**—যত লোক চাষ করত, সে তুলনায় অনেক বেশী ফসল পাওয়ায় মনুষ্যসমাজ আরো আরামে থাকবার চেষ্টা করতে থাকল। তার ফলে নানা লোক মাটির পাত্র, পোশাক, হাতিয়ার, যানবাহন, সুতী কাপড় তৈরি ইত্যাদি বহু শিল্পকর্মে নিযুক্ত হল। মৃৎপাত্রে, মন্দিরের দেয়ালে, সমাধিতে, প্রাসাদে নানারকম ভাস্কর্য এবং চিত্রকলার কাজও যথেষ্ট প্রচলিত হল।

(ঙ) **নতুন নতুন হাতিয়ার তৈরি**—চাষবাস, শিল্পকর্ম, গৃহস্থালী

কাজের জন্যে নতুন নতুন হাতিয়ার তৈরি হতে লাগল। চাষের জমির লোভে যুদ্ধবিগ্রহ বেড়ে গেল। যুদ্ধের জন্যেও নতুন নতুন হাতিয়ার তৈরি শুরু হল। ব্রোঞ্জের সন্ধান পেয়ে ব্রোঞ্জ দিয়ে শক্ত জিনিসপত্র এবং ধারালো অস্ত্র তৈরি হতে লাগল।

(চ) **জলপথে ও স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি**—সমভূমির উপর দিয়ে নদী প্রবাহিত হওয়ায় পালতোলা নৌকা ও জাহাজে দূরদেশ থেকে নানা-দরকারি জিনিস এবং বিলাসদ্রব্য আনবার সুবিধা হল। দরকার হলে তার বদলে নিজেদের বাড়তি জিনিস পাঠানো হতে লাগল। স্থলপথে পশু বা পশুচালিত যানবাহনে এসব কাজ চলত। এভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যও শুরু হল।

(ছ) **নগর-প্রতিষ্ঠা**—বহু লোক একত্র থাকার ফলে নানা জায়গায় নগর প্রতিষ্ঠিত হল। মেসোপোটেমিয়ার ইরেক ও ব্যাবিলন, মিশরের মেম্ফিস ও থিব্স, পশ্চিম ভারতের হরপ্পা ও মোহেন্‌জোদারো, চীনের আনিয়াং ইত্যাদি ছিল বিখ্যাত নগর।

(জ) **মন্দির, পুরোহিত, বিদ্যাচর্চা**—প্রাকৃতিক শক্তির প্রতি ভয় ও শ্রদ্ধা থেকে নগরগুলিতে নানা দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হত। মানুষের উপর পুরোহিতদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তাছাড়া মন্দির-গুলিই ছিল নানাপ্রকার বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র।

(ঝ) **রাষ্ট্রের উৎপত্তি**—নগরগুলিতে রাজা বা পুরোহিতরা আইনকানুন চালাতেন, আইন ভাঙলে বিচার করতেন, শাস্তি দিতেন। তাছাড়া রাজার অধীনে সৈন্যরা যুদ্ধ চালাত। এইভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হল। ক্রমে শক্তিশালী কোনো রাজা ছোটখাটো রাজ্যগুলিকে তাঁর অধীনে এনে বড় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতেন। সিন্ধু উপত্যকায় এ-রকম কোনো রাজার সন্ধান পাওয়া যায় নি। তবে হরপ্পা ও মোহেন্‌জোদারো দূরে দূরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও দুটি শহরের পরিকল্পনা হুবহু একরকম ছিল। এ থেকে মনে হয়, এ দুটি নগরও বড় এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(ঞ) **সামাজিক ও আর্থিক জীবন**—সমাজে নানা শ্রেণীর লোক ছিল। অধিকাংশ লোক স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সংসার করত। এরা ছিল

সমাজের স্থায়ী লোক। এই স্থায়ী সংসারী লোকদের মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়ঃ—(১) অভিজাত—অর্থাৎ রাজা, পুরোহিত, বড় বড় রাজকর্মচারী, সেনাপতি ইত্যাদিরা; (২) বণিক-সম্প্রদায়; (৩) শহরের কারিগর; (৪) কৃষক এবং (৫) পশুপালক। এই পাঁচ শ্রেণীর মধ্যে কৃষকরাই সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী ছিল। এরা খুবই গরীব ছিল। ওদিকে এদের পরিশ্রমে উৎপাদিত শস্যে অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরা আরামে থাকত। অভিজাত ব্যক্তিরা যথেষ্ট বিলাসিতা ও আরামের মধ্যে থাকত। বণিক ও ভাল কারিগররা বেশ সচ্ছল জীবন কাটাত বলে ধারণা করা যায়। স্বাধীনভাবে যারা পশু পালন করত এবং বিক্রি করত, তাদেরও বেশ মর্যাদা ছিল। নগরগুলিতে নাচগান ও নানা আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল।

আবার, এমন বহু মানুষ ছিল যারা ঘর-সংসার করবার সুযোগই পেত না। এদের মধ্যে ছিল যুদ্ধবন্দী, ক্রীতদাস, চাকর, জোর করে নিযুক্ত করা সৈন্য, নৌকা ও জাহাজের মাঝিমাল্লা ইত্যাদি। এদের জীবন ছিল অতি কষ্টের, অতি অসম্মানের।

এক নজরে

আদি নগরসভ্যতাগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য :—(ক) নদী-উপত্যকার সভ্যতা (খ) ব্রোঞ্জ-যুগের সভ্যতা (গ) বন্যানিয়ন্ত্রণের চেষ্টা থেকে সভ্যতা শুরু (ঘ) শিল্পকর্ম ও চারুকলা (ঙ) নতুন নতুন হাতিয়ার তৈরি (চ) আমদানি-রপ্তানি (ছ) নগর প্রতিষ্ঠা (জ) মন্দির, পুরোহিত, বিদ্যাচর্চা (ঝ) রাষ্ট্রের উৎপত্তি (ঞ) সমাজে নানা শ্রেণী ছিল। কৃষকরা দরিদ্র ছিল। যুদ্ধবন্দী, ক্রীতদাস, চাকর, মাঝিমাল্লা ইত্যাদির জীবন ছিল অতি দুঃখের।

অনুশীলনী

ছোট উত্তরধর্মী ও নিবন্ধধর্মী

১। ব্রোঞ্জযুগের নগরসভ্যতার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি কী?

২। ব্রোঞ্জযুগের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখ।

৩। ব্রোঞ্জযুগের নগরসভ্যতার সমাজ ও তার আর্থিক জীবন সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

৪। "ব্রোঞ্জযুগের নগরসভ্যতার শুরু হয় বন্যানিয়ন্ত্রণ থেকে।" দৃষ্টান্ত দিয়ে এই কথাটি বোঝাও।

তৃতীয় অধ্যায়

(তামা-ব্রোঞ্জ যুগ)

৮০০০ খ্রী. পূ. নাগাদ মেসোপোটেমিয়া, মিশর ও ভারতবর্ষে সভ্যতার শুরু
৭০০০ " নাগাদ এই দেশগুলিতে তামা-ব্রোঞ্জযুগের সূত্রপাত

খ্রীষ্টপূর্ব	মেসোপোটেমিয়া	মিশর	ভারতবর্ষ	চীন
৪০০০	২০ টিরও বেশী নগররাজ্য	নগরসভ্যতা চলছে	নগরসভ্যতা চলছে	
৩৫০০	...	...	সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা	
৩২৫০	...	ফেরো মেনেস		
৩০০০	ইরেক, এরিদু, মেম্ফিস, লাগাস, উর, থিব্স ইত্যাদি নগর, আসোয়ান		মোহেন্জোদারো হরপ্পা ইত্যাদি	
২৮০০				
২৫০০	...	...	...	হোয়াং-হোর নদী-সভ্যতা
২৩০০	...	...	...	ইয়াংশাও
২২০০	...	...	...	লুংশান
২২০০	...	...	...	নদী-অঞ্চলে ব্রোঞ্জসভ্যতা

নৈর্ব্যক্তিক

১। যেটির সঙ্গে যেটির মিল, লাইন টেনে যুক্ত কর :

চীনদেশের আদি সভ্যতা	নীলনদী
মোহেন্‌জোদারোর সভ্যতা	ইউফ্রেটিস
মিশরের সভ্যতা	সিন্ধুনদী
মেসোপোটেমিয়ার সভ্যতা	হোয়াংহো

২। একশব্দে উত্তর দাও :

ইরেক কোন্ প্রাচীন অঞ্চলের নগর? ইউফ্রেটিস ছাড়া আর কোন্ নদীর সাহায্যে সুমেরের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল? আসোয়ান কোন্ দেশে? কোথাকার মাটি খুঁড়ে প্রাচীন নগরে স্নানাগার খুঁজে পাওয়া গেছে? মেম্ফিস কোন্ দেশের নগর ছিল? সবচেয়ে বড় পিরামিড কোন্ দেশে তৈরি হয়েছিল?

হাতের কাজ

১। এই বই থেকে ছেপে নিয়ে ব্রোঞ্জযুগের নগরসভ্যতার অঞ্চলগুলি একটি মানচিত্রে দেখাও। বিভিন্ন সভ্যতার অঞ্চলে ভিন্ন রং দাও। নীল রং দিয়ে নদী দেখাও।

পঞ্চম অধ্যায়

লোহাযুগের সমাজ

লোহা আবিষ্কার—সভ্যতার অগ্রগতি—ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র ও হাতিয়ার মানবসভ্যতার যে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ লোহা আবিষ্কারের ফলে তার চেয়েও অনেক বেশী পরিবর্তন দেখা দিল। এসিয়া-মাইনরের* অন্তর্ভুক্ত আর্মেনিয়ায় হিট্টাইট' নামে এক শক্তিশালী ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য জাতি প্রচুর লোহার-খনি আবিষ্কার করল। লোহা গরম করে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে নানারকম অস্ত্রশস্ত্র এবং গৃহস্থালী হাতিয়ার তৈরি করবার কাজে এরা ক্রমেই খুব দক্ষ হয়ে উঠল। ব্রোঞ্জের অস্ত্রের চেয়ে লোহার অস্ত্র অনেক ধারাল। লোহা পাওয়াও যায় অনেক বেশী। ব্রোঞ্জ ব্যবহার করতে পারত শুধু ধনীরা। কিন্তু লোহা সাধারণ লোকেও ব্যবহার করতে শুরু করল। কাঠের বা পাথরের ফলার বদলে কৃষিকাজে

* মোটামুটিভাবে, আরব বাদে পশ্চিম এসিয়াকে এসিয়া-মাইনর বলে।

লোহার ফলা ব্যবহার করায় কৃষির প্রচুর উন্নতি হল। ক্রমে অন্যান্য আর্য জাতিও লোহার ব্যবহার শুরু করল এবং প্রবল প্রতাপে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু লোহার খনির খোঁজ, লোহার জিনিস তৈরির কৌশল এরা গোপন রাখল। মানুষের ইতিহাসে এইভাবে লোহাযুগ শুরু হল। তবে চীনে লোহাযুগ শুরু হয় আরো অন্তত হাজার বছর পরে।

লোহাযুগের সমাজ—যুদ্ধ এবং কৃষির বেলায় এ-যুগে বিরাট পরিবর্তন হলেও সমাজের তেমন কোনো পরিবর্তন হয় নি। আর্যরা যুদ্ধজয় করতে করতে নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন দেশে মানুষেরা ছোট বা বড় গোষ্ঠী বেঁধে থাকত। অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজে নিযুক্ত থাকত। কৃষিক্ষেত্রের উপর গোষ্ঠীর অধিকার থাকত। বিভিন্ন গোষ্ঠীর দলপতিরা মিলে যাঁকে রাজা করতেন, তাঁকে খাজনা দেওয়া হত। বিভিন্ন প্রকার ব্যবসার উন্নতি হয়েছিল এবং বহু মানুষ কারিগরি কাজে নিযুক্ত থাকত। এই কারিগররা কিছুটা স্বাধীনভাবে কাজ করলেও তাদের প্রধানতঃ গোষ্ঠীর জন্যে কাজ করতে হত। কৃষকরা বরাবরের মতই খুব দরিদ্র ছিল। পুরোহিতরা পরিবার ও গোষ্ঠীর জন্য পূজা-অর্চনা করতেন, তবে তাঁরা বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন না। গ্রীস, এসিয়া-মাইনর ইত্যাদি অঞ্চলে যেসব রাজ্য ছিল, সেগুলিতে ক্রীতদাস রাখার নিয়ম ছিল। ক্রীতদাস, ভৃত্য, মাঝিমাল্লা এদের দুর্দশা আগের মতই ছিল। তবে এ-যুগে যুদ্ধবিগ্রহ অনবরত লেগেই থাকত। তাই যুদ্ধে যারা কৃতিত্ব দেখাত, তাদের অবস্থা ভালই ছিল। ভারতীয় আর্যদের মধ্যে মোটামুটি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চার বর্ণ অর্থাৎ শ্রেণী ছিল। ব্রাহ্মণেরা পূজা, যজ্ঞ ও পড়ানোর কাজে, ক্ষত্রিয়রা দেশরক্ষা ও যুদ্ধের কাজে, বৈশ্যরা ব্যবসা ও কৃষির কাজে নিযুক্ত থাকত। শূদ্রেরা এই তিনশ্রেণীর সেবা করত। শূদ্ররা খুবই গরীব ছিল এবং এদের লেখাপড়া করবার সুযোগ দেওয়া হত না।

অসংখ্য রাজ্য, অসংখ্য রাজা—নতুন নতুন ধারাল এবং কঠিন অস্ত্র, ষাঁড়ে-টানা রথ, এসবের সাহায্যে আর্যরা চারদিকে দেশজয় করতে লাগল। এভাবে অসংখ্য ছোটবড় রাজ্যের সৃষ্টি হল। এসব রাজ্যের

রাজারা অন্য রাজাকে হারিয়ে আরো বড় রাজা হবার চেষ্টা করত। অন্য জাতির রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছাড়াও আর্য রাজাদের মধ্যেও পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লেগেই থাকত। কোনো কোনো সময় এক রাজা বহু রাজাকে হারিয়ে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করত। আবার হয়ত তার মৃত্যুর পর সেই সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যেত। এই-সব রাজাদের কথা আর তাদের যুদ্ধবিগ্রহের কথা লোহাযুগের ইতিহাসের অনেকখানি জুড়ে রয়েছে।

১ (ক)—ব্যাবিলন

২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ আরব থেকে অ্যামোরাইট নামে এক দুর্ধর্ষ উপজাতি মেসোপোটেমিয়ায় এসে আক্কাদ অঞ্চল দখল করে। তারপর তারা দক্ষিণের সুমেরু অঞ্চল দখল করে। এদের শাসনকালে ইউফ্রেটিসের তীরে ব্যাবিলন শহর খুব সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।



কৃষি ও বাণিজ্য—ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিসের চারদিকের বিস্তৃত উর্বর অঞ্চলে এরা প্রচুর চাষ করত। বন্যার জলকে নিয়ন্ত্রণ করে জলসেচের ব্যবস্থা করায় প্রচুর ফসল হত। বহু লোক কারিগরি

কাজে নিযুক্ত ছিল। বাড়তি জিনিস বিক্রি করে অন্য দেশ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আমদানি করা হত। এসব ব্যবসাবাণিজ্য স্থলপথেও চলত, আবার জলপথে অর্থাৎ ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস নদীতে নৌকা ও জাহাজ ভাসিয়েও চালানো হত। সেই সময় ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যে সব শহরেই নানা দেবদেবীর মন্দির তৈরি হত। ব্যাবিলনেও এ-রকম মন্দির ছিল। বড় বড় ব্যবসাবাণিজ্যের লেনদেন চালাতেন এইসব মন্দিরের ক্ষমতাবান্ পুরোহিতেরা বা রাজা নিজে।

যেসব জিনিস নিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য চলত, তার মধ্যে প্রধান ছিল খাদ্যশস্য, গরু-মোষ, রুপো ও তামা।

মন্দির ও পুরোহিত—ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যে নানা দেবদেবীর মন্দির গড়ে উঠেছিল। দেবতাদের মধ্যে বেলমার্দুক ও শামাশ, এবং কৃষির দেবদেবী রূপে বিখ্যাত ছিলেন **তম্মুজ ও ইশ্‌তার**। এসব দেবদেবীর নামে উৎসর্গ-করা বিস্তৃত জমিজমা পুরোহিতরাই ভোগ করতেন। পুরোহিতরা যেমন ধনী ছিলেন, তেমনি ক্ষমতাশালী ছিলেন। স্বয়ং রাজাও পুরোহিতশ্রেণীকে সম্মান করে চলতেন।

বিদ্যাচর্চা—এই মন্দিরগুলি ছিল বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। পুরোহিতরা তাঁদের শিষ্যসম্প্রদায়কে নানা বিদ্যায় পারদর্শী করে তুলতেন। অবশ্য ক্রমে ক্রমে মন্দিরের বাইরেও বিদ্যাচর্চা শুরু হয়। লেখবার জন্যে কিউনিফর্ম লিপি প্রচলিত ছিল। কাদামাটি দিয়ে ফলক তৈরি করে তার উপর নলখাগড়া দিয়ে খোঁচা মেরে এই লিপি লেখা হত। তারপর আগুনে পুড়িয়ে নিলে ফলকগুলি দীর্ঘকাল রাখা যেত। ব্যাবিলনিয়ার বেশ কিছু সাহিত্য আজো টিকে আছে। তার মধ্যে গিলগামেশের মহাকাব্য বিখ্যাত। কৃষিকে কেন্দ্র করে ব্যাবিলনিয়ার বিজ্ঞানচর্চা শুরু হয়। ষাট পর্যন্ত গোনা এবং ষাট দিয়ে কোনো বৃহৎ সংখ্যাকে প্রকাশ করা এদেশে আগে থেকেই চালু ছিল। সেই অনুসারে আজো বৃত্তকে ৩৬০ ডিগ্রী হিসাবে প্রকাশ করা হয়। ব্যাবিলনিয়ার মানুষ সরল ভগ্নাংশ, ঘনফল, ক্ষেত্রফল এবং বর্গমূল, এসব অঙ্ক জানত। জ্যোতির্বিদ্যায়ও এরা বেশ অগ্রসর ছিল। তারা সৌরজগতের পাঁচটি গ্রহ চিনত এবং সেগুলির কক্ষপথও হিসাব

করতে পারত। চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষ করে এরা পঞ্জিকা তৈরি করতে পারত। এই পঞ্জিকা অনুযায়ী বছর, মাস, দিন হিসাব করত। প্রত্যেক দিনকে এরা বারো ঘণ্টায় এবং প্রত্যেক ঘণ্টাকে ৩০ মিনিটে ভাগ করত।

হাম্মুরাবির আইনমালা—ব্যাবিলনের অ্যামোরাইট রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন হাম্মুরাবি (রাজত্বকাল : ১৭৯২-১৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। উত্তরের বহু রাজ্য ও শহর দখল করে' ইনি ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যকে সুবিশাল করে তোলেন। সাম্রাজ্যে সুশাসন চালাবার জন্যে তিনি বিরাট এক আইনমালা প্রণয়ন করেন। ব্যাবিলনের দেবতা মার্ডুকের মন্দিরে এক বিশাল শিলাস্তম্ভে হাম্মুরাবি ২৮২টি অনুচ্ছেদে তাঁর সাম্রাজ্যে প্রচলিত প্রায় সব আইন খোদাই করিয়েছিলেন। আজো এই শিলালিপি অক্ষত অবস্থায় আছে। মানুষের ইতিহাসে তিনিই প্রথম এভাবে আইনমালা লিপিবদ্ধ করেন। এই আইনমালা থেকে জানা যায় যে, খুন, ক্রীতদাস বা শিশু চুরি, তহবিল তছরুপ, চুরি ইত্যাদি অপরাধের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড।

সমাজের অবস্থা—হাম্মুরাবির আইনমালা থেকে সে-কালের ব্যাবিলনীয় সমাজের প্রায় পুরো পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজ প্রধানতঃ তিনটি স্তরে বিভক্ত ছিল—স্বাধীন নাগরিক, প্রজা এবং ক্রীতদাস। সৈনিকেরা এই শর্তে জমিজমার অধিকার পেত যে, তাদের যুদ্ধে যোগ দিতে হবে। জমির মালিক, পুরোহিতশ্রেণী এবং ব্যবসায়ীদের সম্পত্তি রক্ষার নিশ্চয়তা দেওয়া হত। কৃষি ছাড়াও, বহু লোক ব্যবসাবাণিজ্য এবং নানারকম শিল্পকাজ ও কারিগরি কাজ করত। আইনমালায় এসব কাজের উল্লেখ আছে :—পাথরের বাড়িঘর তৈরি, মাটির পাত্র তৈরি, পোশাক তৈরি, চামড়া পাকা করা এবং লোহার জিনিস তৈরি।

আইনমালা থেকে সেকালের ক্রীতদাসত্ব সম্পর্কেও জানা যায়। 'ঋণদাসত্ব' যথেষ্ট পরিমাণে প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেউ ঋণ শোধ দিতে না পারলে ঋণী ব্যক্তিকে বা তার ছেলেকে গায়েগতরে খেটে সেই ঋণ শোধ দিতে হত। আগে আজীবন

খেটে ঋণশোধের প্রথা ছিল। হাম্মুরাবি সময়সীমা সর্বোধ্ব´ তিন বছরের মধ্যে বেঁধে দেন।

হাম্মুরাবির আমলে ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের প্রচুর উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু এই উন্নতির যুগ বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। পর পর শত্রুর আক্রমণে কিছুকাল পরই ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়।

এক নজরে (১) ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ অ্যামোরাইট জাতি ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। (২) কৃষি ও বাণিজ্যে এই সাম্রাজ্য উন্নত ছিল। (৩) নানা দেবদেবীর মন্দির ছিল। পুরোহিতশ্রেণী ধনী ও ক্ষমতাশালী ছিল। (৪) মন্দির ও অন্যত্র বিদ্যাচর্চা হত। সাহিত্য, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা শুরু হয়েছিল। (৫) শ্রেষ্ঠ রাজা হাম্মুরাবি তাঁর আইনমালার শিলাস্তম্ভের জন্য বিখ্যাত। (৬) এই আইনমালা থেকে সমাজের কথা জানা যায়। (৭) হাম্মুরাবির পরে শত্রুসৈন্যের আক্রমণে এই সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে।

---

১ (খ)—মিশরের সাম্রাজ্য

মিশরের পুরানো রাজ্য বহু ভাগে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ আবার মিশর একরাজ্য রূপে গড়ে ওঠে। এর প্রায় দুশ বছর পর এসিয়া থেকে হিক্‌সোস নামে এক দুর্ধর্ষ উপজাতি এসে প্রায় দেড়শ বছর মিশর দখল করে রাখে। অবশেষে ফেরো প্রথম আহ্‌মোস হিক্‌সোসদের পরাজিত করে বহুদূর পর্যন্ত তাদের তাড়িয়ে দেন। মিশর আবার ঐক্যবদ্ধ রাজ্যরূপে গড়ে ওঠে।

উপনিবেশ—এর পর বিরাট শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করে ফেরো তৃতীয় **থোথ্‌মেস** খ্রীষ্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দীতে নানা রাজ্য জয় করেন। সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, নিউবিয়া, লিবিয়া প্রভৃতি তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং এসব দেশে মিশরের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। যুদ্ধবিজয়ের পর প্রচুর লুণ্ঠিতদ্রব্য রাজার কোষাগারে, শস্যভাণ্ডারে জমা পড়ত। হাজার হাজার ক্রীতদাস এবং গরু-মোষ সম্রাটের অধীনে আসত।

চেম্বার্সের অভিধানে Pharaoh শব্দের উচ্চারণ দেওয়া আছে 'ফেরো'। 'ফে' অক্ষরটির উচ্চারণ face শব্দের 'fa'-র মতো।

ফেরোরা নিজেদের দেবপুত্র বলে মনে করতেন এবং সেভাবে প্রচার করতেন। সৈন্যেরাও ভাবত, তারা দেবতার হয়ে যুদ্ধ করছে! ফেরোদের যেসব মূর্তি পাওয়া গেছে, তার অনেকগুলিতে দেখা যায়, নানা দেবদেবী ফেরোকে আশীর্বাদ করছেন।

খ্রীষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ফেরো **দ্বিতীয় রামেসিস** শেষ বড় যুদ্ধযাত্রা করেন। তবে এই যুদ্ধযাত্রা নতুন উপনিবেশ স্থাপন করতে নয়। এই যুদ্ধযাত্রা হয়েছিল হিট্‌টাইট নামে এক আর্যজাতির আক্রমণ থেকে মিশরের উপনিবেশ সিরিয়াকে রক্ষা করতে। দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলেছিল। সিরিয়ার অনেকট মশরের অধীনে রহ২০, কিছু অংশ হিট্‌টাইটরা ছিনিয়ে নিল।



মিশরের একটি প্রাচীরচিত্র

দু'শ বছরেরও বেশী কাল ধরে বিভিন্ন ফেরোর আমলে মিশর ধনসম্পদ সংগ্রহ, ব্যবসাবাণিজ্য, স্থাপত্য, শিল্পকলা ও ভাস্কর্যে প্রচুর উন্নতি করে। এই সময় মিশরের রাজধানী ছিল থিব্‌স। দ্বিতীয় রামেসিসের সময়েও মিশরের এই উন্নতি অব্যাহত ছিল।

পুরোহিতদের ক্ষমতা—ব্যাবিলনের মত অতটা প্রতাপ না থাকলেও মিশরেও পুরোহিতশ্রেণী খুব প্রভাবশালী ছিল। তবে ফেরোর সম্মান পুরোহিতদের চেয়েও বেশী ছিল।

তাহলেও, রাজ্য জয় করে ফেরোরা যেসব জিনিস লুণ্ঠন করে আনতেন, তা থেকে মন্দিরের এবং পুরোহিতদের কাছে নানা মূল্যবান উপহার পাঠাতেন। এ-রকম এক যুদ্ধজয়ের পর এক ফেরো রাজধানী থিব্‌সের প্রধানদেবতা **'অ্যামন রা'**-কে লেবানন রাজ্যের এক বিরাট

অঞ্চল এবং তিনটি শহর সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছিলেন।

এসবের ফলে, দেশশাসনের ক্ষেত্রেও পুরোহিতশ্রেণীর আধিপত্য খুব বেড়ে গিয়েছিল। থিব্‌সের 'অ্যামন-রা'-এর মন্দির সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল। 'অ্যামন-রা'-এর মন্দিরের অধীনে যত জমিজমা, ক্রীতদাস, কর্মচারী এবং কৃষক ছিল, দেশের অন্য সমস্ত মন্দির একত্র করলেও তত ছিল না। তাই রাজধানী থিব্‌সের পুরোহিত সম্প্রদায় শাসনকাজে রীতিমত ক্ষমতা বিস্তার করতে চাইতেন।

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে মিশরের ফেরো ছিলেন চতুর্থ অ্যামেনোফিস। এঁর সঙ্গে থিব্‌সের 'অ্যামন-রা'-এর মন্দিরের পুরোহিতদের দীর্ঘ বিরোধ হয়েছিল। দেশের নানা অঞ্চলের মানুষ নানা দেবদেবীর পূজা না করে এক দেবতার পূজা করুক, এটা ছিল তাঁর আদর্শ। তাই তিনি সর্বত্র 'অ্যাটন' অর্থাৎ সূর্যের পূজা প্রচলন করলেন। কিন্তু 'অ্যামন-রা'র পুরোহিতেরা তাঁর প্রবল বিরোধিতা করল। ফেরো থিব্‌স ছেড়ে চলে গিয়ে 'তেল্-এল্-অমর্না'য় রাজধানী স্থাপন করলেন। আগে 'অ্যামন-রা'-এর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে তাঁর নাম ছিল 'অ্যামেনোফিস'। এখন তিনি নতুন করে 'অ্যাখ্‌ন্-অ্যাটন্' (অর্থাৎ সূর্যের মহিমা) নাম নিলেন। সেই থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ আঠারো বছর সাম্রাজ্যের সমস্ত পুরোহিতকে অগ্রাহ্য করে ফেরো অ্যাখ্‌ন্-অ্যাটন্ সাম্রাজ্যে তাঁর মত এবং আদর্শকেই টিকিয়ে রাখেন। তাঁর বিরুদ্ধে পুরোহিতরা প্রবল আন্দোলন করেছিল, একবার বিদ্রোহের সৃষ্টিও করেছিল, কিন্তু অ্যাখ্‌ন্-অ্যাটন্ দৃঢ়ভাবে তা দমন করেন।



ফেরো চতুর্থ অ্যামেনোফিস

কিন্তু অ্যাখ্‌ন্-অ্যাটনের মৃত্যুর পর (খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৮৮) আবার পুরোহিতরা প্রবল হয়ে ওঠে। অ্যাখ্‌ন্-অ্যাটনের 'এক ঈশ্বরের' আদর্শ

সময়রেখা (৩)

লোহাযুগের সমাজ : ব্যাবিলন

২০০০ খ্রী. পূ.	লোহা-আবিষ্কার ও ব্যবহার শুরু অ্যামোরাইট উপজাতির মেসোপোটেমিয়া জয় এবং ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা
১৮০০ খ্রী. পূ.	হাম্‌মুরাবি (১৭৯২-১৭৫০ খ্রী. পূ.)
১৭০০ ”	

সময়রেখা (৪)

লোহাযুগের সমাজ : মিশর

২১০০ খ্রী. পূ.	
২০০০ খ্রী. পূ.	বিচ্ছিন্ন মিশর আবার ঐক্যবদ্ধ হল
১৯০০ খ্রী. পূ.	মিশরে কৃষকবিদ্রোহ
১৮০০ ”	
	হিক্‌সোসদের আক্রমণ
১৭০০ ”	
১৬০০ ”	
	প্রথম আহ্‌মোস (হিক্‌সোস বিতাড়ন) তৃতীয় থোথ্‌মেস (১৫২৫-১৪৯১)
১৫০০ ”	
	চতুর্থ অ্যামেনোফিস (১৪২৪-১৩৮৮) (অ্যাখ্‌ন্যাটন)
১৪০০ ”	
	দ্বিতীয় রামেসিস (১৩১৭-১২৫১)
১৩০০ ”	
	মিশরের সাম্রাজ্যে ভাঙন শুরু
১২০০ ”	

পরিত্যাগ করা হয়। পুরোহিতদের ক্ষমতা আগের চেয়েও বেড়ে যায়। রাজাদের মত প্রধান পুরোহিতের পদ তার ছেলেই পেত।

দ্বিতীয় রামেসিসের পর থেকে মিশরীয় সাম্রাজ্যের ভাঙন শুরু হয়। এসিয়া-মাইনরের নানা জাতির আক্রমণে মিশর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অবশেষে পারসিক শক্তির অধীন হয়।

এক নজরে (১) ১ম আহ্‌মোস হিকসোসদের তাড়িয়ে মিশরকে ঐক্যবদ্ধ রাজ্যরূপে গড়ে তোলেন। (২) তৃতীয় থোথ্‌মেসের সময়ে প্রচুর উন্নতি হয় ও বহু উপনিবেশ স্থাপিত হয়। (৩) ফেরোদের দেবতা ভাবা হত। (৪) দ্বিতীয় রামেসিস। (৫) পুরোহিত সম্প্রদায়ের অবস্থা (অ্যামন রা)। (৬) চতুর্থ অ্যামেনোফিসের (অ্যাথ্‌ন্‌-অ্যাটন) সঙ্গে পুরোহিতদের সংঘর্ষ (৭) আবার পুরোহিতদের ক্ষমতাবৃদ্ধি। (৮) সাম্রাজ্যের পতন।

---

১ (গ) ইরান

মেসোপোটেমিয়ার পূর্বদিকে ইরানের বিস্তৃত মালভূমি। এই মালভূমির মাঝামাঝি মাটি শুকনো ধরনের, কিন্তু মালভূমির নীচের দিক অরণ্যপূর্ণ ছিল। এই অংশে সোনা, রুপো, তামা, সীসা, লোহা, ইত্যাদির প্রচুর খনিও ছিল। এখানে প্রাচীনকালে রাই, গম এবং বার্লির চাষ হত।

পারসিক শক্তির উত্থান—খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের পর আর্যদের ইরানীয় শাখা এই অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং নানা জায়গায় বাস করতে শুরু করে। খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে ইরানীয়দের মধ্যে পারসিক এবং মীডী উপজাতি প্রবল হয়ে ওঠে। মীডীরা প্রথম দিকে প্রবল হয়ে মীডীয়া রাজ্য স্থাপন করে। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারসিকরা তাদের হারিয়ে পারস্য রাজ্য স্থাপন করে।

যে রাজা পারস্য রাজ্য স্থাপন করেন, তাঁর নাম ছিল কাইরুস (৫৫৯—৫২৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। মীডীয়া দখলের পর ইনি এসিয়া-মাইনরের বহু রাজ্য জয় করেন। স্বর্ণভাণ্ডার এবং ঐশ্বর্যের জন্য বিখ্যাত লিডিয়া রাজ্য জয় করে কাইরুস প্রচুর ধনরত্ন অধিকার

করেন। ব্যাবিলনিয়া দখল করা কঠিন হল না (৫৩৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। তিনি ফীনিসিয়া এবং প্যালেস্টাইনও দখল করেন। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল প্রবল সাম্রাজ্য মিশর অধিকার করা। কিন্তু এক যুদ্ধে হঠাৎ নিহত হওয়ায় তাঁর এই সংকল্প সফল হয়নি। কাইরুসের ছেলে ক্যাম্‌বাইসিজ মিশর জয় করেন। কিন্তু মাত্র সাত বছর রাজত্বের পর তিনি মারা যান।

ক্যাম্‌বাইসিজের উত্তরাধিকারী ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর দারায়ুস পারস্যের রাজা হলেন। ইনি ছিলেন পারস্যের সবচেয়ে বিখ্যাত এবং দিগ্বিজয়ী সম্রাট। এঁর সময় পারস্য সাম্রাজ্য মিশর থেকে সিন্ধু-উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বহু রাজ্য জয় করবার পর এঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী সর্বপ্রথম পরাজিত হয় গ্রীসের এক ক্ষুদ্র রাষ্ট্র অ্যাথেন্সের সৈন্যদলের কাছে। এই পরাজয়ের সংবাদ পাবার কিছুদিন পরই দারায়ুস মারা যান (খ্রী. পূ. ৪৮৬)।

এই বিশাল পারস্য-সাম্রাজ্য কিভাবে শাসন করা হত, পাহাড়ের গায়ে খোদিত "দারায়ুসের লিপি" থেকে তার বিবরণ জানা যায়। পারস্য-সম্রাট যেসব দেশ জয় করতেন, তার প্রতিটিতে স্যাট্র্যাপ বা প্রদেশপাল নিয়োগ করতেন। প্রদেশগুলিকে 'স্যাট্রাপি' বলা হত। সব স্যাট্রাপি সম্রাটকে খাজনা হিসাবে অর্থ এবং অন্য জিনিস দিতে বাধ্য থাকত। স্যাট্রাপিগুলি থেকে এভাবে খাজনা আদায়ের ফলে দারায়ুস এক বিশাল ধনভাণ্ডারের অধিকারী হয়েছিলেন। বিভিন্ন রাজ্যে যাতায়াতের সুবিধার জন্যে তিনি বহু রাস্তা তৈরি করান। রাস্তাগুলিতে পথিকদের জন্য পান্থশালা থাকত। এসব রাস্তার ফলে সৈন্যবাহিনীর চলাফেরায় ও ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধা হত। তিনি স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেন। সাম্রাজ্যের পারসিকরা সবচেয়ে বেশী মর্যাদা পেত। অন্য প্রজাদের খাজনা দিতে হত, পারসিকদের দিতে হত না। দারায়ুসের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে জার্ক্‌সিজ্‌ * সম্রাট হন। তিনি এবং তাঁর পরবর্তী সম্রাটেরা গ্রীসের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ করেছিলেন। দু-একটি যুদ্ধে পারসিক সৈন্যরা সফল হলেও,

* 'জার্ক্‌সিজ্‌' শব্দে 'জ' z-এর মতো উচ্চারিত।

দেশপ্রেমিক গ্রীকসৈন্যদের বুদ্ধি ও বীরত্বের কাছে তারা ক্রমে হটে যেতে লাগল।

কাইরুস থেকে শুরু করে পারস্য-সম্রাটেরা ২২০ বছর একটানা রাজত্ব করেন। অবশেষে গ্রীকবীর অ্যালেকজ্যাণ্ডার পারস্য-সাম্রাজ্য অধিকার করেন এবং আগুন লাগিয়ে বিখ্যাত শহর পার্সেপোলিসে অবস্থিত সম্রাটের প্রাসাদটি ধ্বংস করেন (৩৩৩ খ্রী.-পূ.)।

গ্রীকশক্তি পাঁচশ বছরেরও বেশী রাজত্ব করার পর খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে ইরানে আবার পারসিক রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশের নাম **সাসানিড** রাজবংশ। এই বংশের রাজত্বকালে সৈন্যশক্তি, সাহিত্য, শিল্প, চিত্রকলা ইত্যাদি সবদিকেই ইরানের বিশেষ উন্নতি হয়। সাসানিডদের যুগেই সম্ভবতঃ পারসিক ধর্মপুস্তক আবেস্তা রচনা সম্পূর্ণ হয়। সপ্তম শতাব্দীতে আরবের মুসলমান-শক্তি ইরান দখল করবার আগে পর্যন্ত সাসানিড বংশই ইরানে রাজত্ব করেছিল।

জরথুষ্ট্র—কাইরুসের আমল থেকেই ইরানে জরথুষ্ট্রের প্রচারিত ধর্মমত প্রচলিত ছিল। জরথুষ্ট্রের জন্মকাল সম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছু জানা যায় না। তিনি আর্য ছিলেন। তাঁর উপদেশ ও ধর্মমত **জেন্দ্ আবেস্তা** নামক গ্রন্থে লিখিত আছে। তাঁর ধর্মমত অনুযায়ী, ছুজন দেবতা আছেন—একজন ভাল দেবতা, আর একজন খারাপ। ভাল দেবতার নাম অরমুজ্দ্ এবং খারাপ দেবতার নাম আ-রিমান। অরমুজ্দ্ হলেন আলো, সরলতা, সত্যবাদিতা এবং সূর্যের দেবতা। আ-রিমান হলেন ছলচাতুরি, গোপনতা, ধূর্ততা, অন্ধকার এবং রাত্রির দেবতা। এই ধর্মমতে এই ছুই দেবতার প্রতি নানারকম পূজা-অর্চনার ব্যবস্থা আছে, নানারকম অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও আছে। এসব পূজা বা অনুষ্ঠানের জন্যে পুরোহিত প্রয়োজন। এই ধর্মে কোনো মূর্তি নেই, মূর্তিপূজাও নেই। তবে পুরোহিত আছে, মন্দির আছে, বেদী আছে। বেদীর উপর পবিত্র আগুন জ্বালিয়ে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হয়। এই ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী মৃতদেহ দাহ করা হয় না, কবর দেওয়াও হয় না। জরথুষ্ট্রীয় ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বোধহয় বর্তমানে ভারতের 'পারসী' সম্প্রদায়ই টিকে আছে। এরা পাঁচিলঘেরা 'নীরবতার

প্রাসাদে' মৃতদেহ রেখে আসে শকুনের অপেক্ষায়।

জরথুষ্ট্রীয় ধর্ম ইরানে খুবই প্রচলিত ছিল। সাসানিড রাজবংশের আমলে. এই ধর্মকে সরকারী ধর্ম রূপে গ্রহণ করা হয়। এই ধর্মের প্রধান পুরোহিতের মর্যাদা ছিল রাজার পরেই। রাজাকে দেবতা অরমুজ্‌দের অতি প্রিয়পাত্র ভাবা হত।

তবে পারস্যে জরথুষ্ট্রীয় ধর্মের বিরুদ্ধে নানা ধর্মমত প্রচারিত হতে থাকায় এই ধর্মের ব্যাপক প্রভাব ক্রমে কমে এসেছিল।

এক নজরে (১) আর্যদের শাখা ইরানীয়রা ইরানের মালভূমিতে বাস করতে থাকে। (২) এদের দুই শাখার মধ্যে পারসিকরা প্রবল হয়ে ওঠে। (৩) কাইরুসের অভিযান, ব্যাবিলন বিজয়; (৪) ক্যামবাইসিজের মিশর জয় (৫) দারায়ুস :—বিশাল সাম্রাজ্য, গ্রীক শক্তির কাছে পরাজয়, শিলালিপিতে দেশ-শাসনের বিবরণ (৬) পতন (৭) সাসানিড রাজবংশ (৮) জরথুষ্ট্র।

---

১ (ঘ) ইহুদী জাতি

মধ্য-এসিয়া, পশ্চিম-এসিয়া, এসিয়া-মাইনর, মিশর, এইসব অঞ্চলের নানা শক্তির উত্থান-পতনের অন্দোলনের সঙ্গে আর একটি জাতির ভাগ্য বারে বারে জড়িয়ে পড়ছিল। সেটি হল হিব্রু বা ইহুদী জাতি। এরা প্রধানতঃ পশুপালন করে জীবন যাপন করত। এরা যে অঞ্চলে বাস করত, প্রাচীনকালে তার নাম ছিল ক্যানান। ক্যানানের প্রায় সবটাই এখন জর্ডন রাষ্ট্রের অন্তর্গত। বর্তমানে ইহুদীদের দেশ হয়েছে 'ইজরায়েল'। তার আগে এই অঞ্চল প্যালেস্টাইনের অন্তর্গত ছিল।

মিশরে ইহুদীরা—ইহুদী-জাতির বিখ্যাত ধর্মগ্রন্থ 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' থেকে এদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। প্রথমে এদের অধিকাংশই ছিল দরিদ্র এবং যাযাবর শ্রেণীর। খাদ্যের সন্ধানে এরা ভেড়ার পাল এবং গোরু-মোষ চরাতে চরাতে ব্যাবিলনিয়া এবং মিশরের মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলিতে ঘুরে বেড়াত। বোধহয় হাম্মুরাবির সময়ে এরা ক্যানানে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করে। একবার

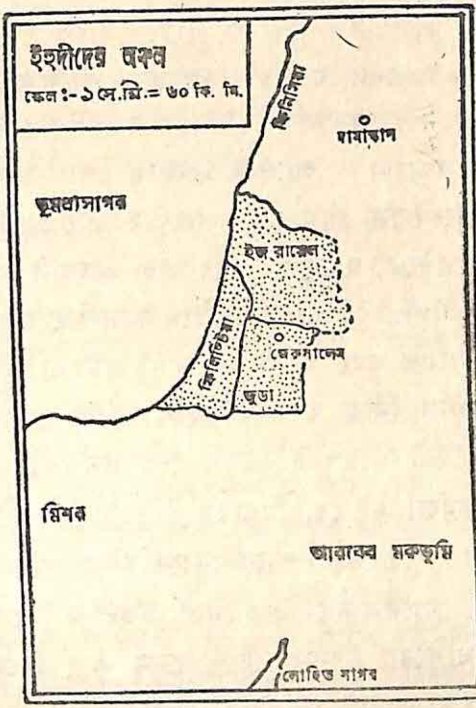
সমন্বয়রেখা (৫)

লোহাযুগের সমাজ ঃ ইরান

৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে যেসব আর্য উপজাতি ইরানে প্রবেশ করে, তাদের মধ্যে খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে পারসিক ও মীডীরা প্রধান হয়ে ওঠে। অবশেষে খ্রী. পূ. ষষ্ঠ শতাব্দীতে মীডীদের হারিয়ে পারসিকরা সাম্রাজ্য স্থাপন করে।

খ্রীষ্টপূর্ব	
৬০০	
	৫৩৮—কাইরুসের ব্যাবিলন জয়
	৫২৫—ক্যাম্বাইসিজের মিশর জয়
৫০০	দারায়ুস (৫২২-৪৮৬) ও তাঁর দিগ্বিজয়। জরথুষ্ট্রীয় ধর্মের প্রসার।
	জার্কসিজ্-এর গ্রীস আক্রমণ ও পরাজয় (৪৮৬-৪৫৯)
৪০০	
	৩২৩—অ্যালেকজ্যাণ্ডারের পারস্যবিজয়
৩০০	গ্রীক শাসন
২০০	
১০০	" "
খ্রীষ্টাব্দ	" "
১০০	" "
২০০	" "
	সাসানিড রাজবংশ (৬৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত)
৩০০	

ক্যানানে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় খাদ্যশস্যের খোঁজে এরা মিশরে চলে গেল। মিশরের ফেরোর কৃপায় ওরা মিশরের একটি স্থানে বাস করবার আদেশ পেল। কিন্তু পরবর্তী এক ফেরো হিব্রু বা ইহুদীদের



সংখ্যা বাড়ছে দেখে এদের উপর অত্যাচার শুরু করলেন। অনেককে মিশরীয়দের ক্রীতদাসত্ব করতে বাধ্য করা হল, অনেককে জোর করে ইট তৈরির কাজে লাগান হল। ফেরোর আশা ছিল, এইভাবে অত্যাচার করলে হয়ত এরা মিশর ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু কেউ গেল না। কেন না প্রচণ্ড পরিশ্রমের বদলে এখানে তবু একমুঠো খেতে তো পাওয়া যায়!

মোজেস—ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি—এই অসহনীয় কষ্টের জীবন থেকে ইহুদীদের মুক্তির পথ দেখালেন মোজেস। ওল্ড্ টেস্টামেন্টে তাঁর যে জন্মবৃত্তান্ত ও শৈশবকাহিনী দেওয়া হয়েছে, তা রহস্যময়। মোজেস ইহুদীদের দল বেঁধে মিশর ছেড়ে ক্যানানের দিকে যাবার জন্যে উৎসাহ দিলেন। কিন্তু এতে ফেরো চটে গেলেন। এখন তাঁর মনে

হল, প্রায় বিনা খরচে এতগুলো ক্রীতদাস থাকায় মিশরীয়দের বেশ সুবিধাই হচ্ছে। মোজেস ফেরোকে বহু অনুরোধ করলেন, কিন্তু ফেরো তাঁর কথায় কানই দিলেন না। এদিকে পরিশ্রান্ত, ক্ষুধার্ত ইহুদীরাও মোজেসের কথায় এদেশ ছাড়তে সাহস পেল না। তখন মোজেস তাদের বললেন যে, তিনি ভগবানের আদেশেই তাদের এই পরামর্শ দিয়েছেন। অবশেষে তিনি এক রাতের অন্ধকারে ইহুদীদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আরবের মরুভূমি, লোহিত সাগর, সিনাই রাজ্যের পাহাড়-পর্বত পার হয়ে অবশেষে তাদের নিয়ে ক্যানানে পৌঁছালেন। নিজেদের দেশে ফিরে তারা চাষবাস করে সভ্যজীবন যাপন করতে লাগল। জেরুজালেম হয়ে উঠল তাদের প্রসিদ্ধ নগর।

ধর্মগ্রন্থে অনেক সময় অলৌকিক নানা কাহিনী থাকে। কিন্তু অলৌকিক ঘটনা নিয়ে তো ইতিহাস লেখা যায় না। তাই মোজেসের কাহিনী নিয়েও ঐতিহাসিকদের মনে কিছু সংশয় আছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা এই যে, মিশরের ইতিহাসে ইহুদীদের মিশরে আশ্রয় নেওয়া বা মোজেস সম্পর্কে কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। সে যাই হোক, মোজেস নামে এক নেতা ইহুদী-জাতিকে মুক্ত করে সভ্য জীবন যাপনের উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং নিজেই সেকাজে তাদের পরিচালনা করেছিলেন, এটা ইতিহাসে স্থান পাবার যোগ্য।

এক নজরে (১) ক্যানানে যাযাবর ইহুদীরা স্থায়ী বসবাস শুরু করেছিল। (২) কিছু ইহুদী দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যের সন্ধানে মিশরে গিয়েছিল। প্রথমে সুখে জীবন কাটালেও পরে তারা ক্রীতদাসে পরিণত হয়। (৪) মোজেসের নেতৃত্বে তারা ক্রীতদাসত্বের জীবন থেকে পালিয়ে ক্যানানে আসে।

অনুশীলনী

নিবন্ধধর্মী ও ছোটউত্তরধর্মী

১। লোহাযুগের সূত্রপাত কখন কোন্ দেশে হয়েছিল?
২। লোহাযুগের সমাজব্যবস্থা গোড়ার দিকে কেমন ছিল?
৩। লোহাযুগে প্রচুর রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল কেন?
৪। লোহা আবিষ্কারের ফলে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সুবিধা হয়েছিল?
৫। ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের কৃষি ও বাণিজ্যের অবস্থা বর্ণনা কর।

৬। ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের দেবদেবী ও পুরোহিতদের বর্ণনা দাও।
৭। হাম্মুরাবির আইনমালা কেন বিখ্যাত ?
৮। ফেরোদের উপনিবেশস্থাপন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৯। মিশরে ফেরোদের সঙ্গে পুরোহিতদের সম্পর্ক কেমন ছিল ?
১০। কাইরুসের কৃতিত্ব বর্ণনা কর। তিনি মিশর জয় করেন নি কেন ?
১১। দারায়ুসের শিলালিপি থেকে তাঁর আমলের কী কী জানা যায় ?
১২। জরথুষ্ট্র সম্পর্কে যা জান লেখ। ইরানে তাঁর কতটা প্রভাব ছিল ?
১৩। মোজেসের নেতৃত্বে মিশর থেকে ইহুদীদের প্রত্যাবর্তন সংক্ষেপে লেখ।

নৈর্ব্যক্তিক

১। শুদ্ধ উত্তর ছাড়া বাকিগুলি কেটে দাও :—

মোজেস ছিলেন পারসিক / মিশরীয় / ইহুদী নেতা। হাম্মুরাবি ব্যাবিলনের/ মিশরের / ইরানের রাজা ছিলেন। তম্মুজ এবং বেল মার্ডুক ছিলেন ইরানের / ইহুদীদের / ব্যাবিলনের দেবতা। লোহা আবিষ্কার করেছিল ইহুদীরা / হিট্-টাইটরা / মিশরীয়রা।

২। এককথায় উত্তর দাও :—তৃতীয় থোথ্মেস কোথাকার রাজা ছিলেন ? অ্যামন-রা কোন্ দেশের দেবতা ছিলেন ? হাম্মুরাবির আইনমালা কিসের উপর লেখা হয়েছিল ? কোন্ ফেরো অ্যাটনের পূজার প্রচলন করেন ? পারস্যের কোন্ সম্রাট সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ? জরথুষ্ট্রীয়দের ধর্মগ্রন্থের নাম কী ?

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর :—ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থের নাম —। প্রথমে ইহুদীদের দেশের নাম ছিল —। প্রথমে লোহার খনি আবিষ্কার হয় —। ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল —। দ্বিতীয় রামেসিস — র বিরুদ্ধে শেষ বড় যুদ্ধ করেন। ফেরো — পুরোহিতদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।

হাতের কাজ

১। একটি মানচিত্র এঁকে তাতে ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য, মিশরীয় সাম্রাজ্য, পারস্য সাম্রাজ্য এবং ইহুদীদের অঞ্চল দেখাও।

২। গ্রীস

ভূমধ্যসাগরের উত্তর উপকূলে ছোট দেশ গ্রীস। গ্রীসের পূর্বে ঈজিয়ান সাগর। গ্রীসের উন্নতির বহু আগে এই সাগরের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত ক্রীট দ্বীপকে কেন্দ্র করে এক উচ্চস্তরের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। ইতিহাসে এই সভ্যতা **ঈজিয়ান সভ্যতা** নামে বিখ্যাত।

এই সভ্যতার অপূর্ব নিদর্শন পাওয়া গেছে নোসস্ শহরে। এখানে যে প্রাচীন রাজপ্রাসাদ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে সিংহাসন, সভাঘর,



ঈজিয়ান সাগরের অঞ্চল

গোলক ধাঁধার ধরনে তৈরী বারান্দা, স্নানঘর ইত্যাদি রয়েছে। মাঝখানের হল্‌ঘরে দেয়ালজোড়া বিরাট বিরাট ছবি।

ক্রীটে চাষবাসের সুবিধা ছিল না। কিন্তু সারা দ্বীপ দামীকাঠের গাছ ও জলপাই গাছে ভর্তি ছিল। ক্রীটের লোকেরা চারদিকের সভ্য দেশগুলিতে কাঠ ও জলপাইতেল বিক্রি করে অল্পদিনেই ধনী হয়ে উঠেছিল। এরা শিল্পকর্মেও উন্নত ছিল। লেখাপড়ার কাজে লিপি ব্যবহৃত হত, কিন্তু এখনো সেই লিপি সম্পূর্ণভাবে পড়া যায় নি। পড়া গেলে খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ সালের এই সভ্যতা সম্পর্কে আরো জানা যাবে। তবে রাজারা যে ব্যবসাবাণিজ্য করেই ধনসঞ্চয় করতেন, এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। নানাদিকে উন্নত হওয়ায় তখনকার দেশগুলির উপর ক্রীটের প্রভাব ছিল।

হোমারিক যুগ—কিন্তু উত্তর দিক থেকে নানা আর্য জাতি প্রবলবিক্রমে গ্রীস ও ভূমধ্যসাগর-অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার করতে লাগল। এদের এক জাতি দক্ষিণগ্রীসে মিসেনী ও অন্যান্য শহর প্রতিষ্ঠা করল। ওদিকে সেমিটিক ভাষাভাষী জাতিরা ভূমধ্য সাগরের পূর্ব-উপকূলে ট্রয়, টায়ার, সিডান প্রভৃতি বহু শহর গড়ে তুলেছিল। ছ শ বছর ধরে ক্রীট ভূমধ্যসাগর-অঞ্চলে যে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, তা মিসেনীয়দের হাতে চলে গেল। খ্রীষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে মিসেনীয়দের সঙ্গে ট্রয়ের প্রবল যুদ্ধ বাধল। এই 'ট্রয়ের যুদ্ধ' নিয়ে ইলিয়াড ও ওডিসি নামে দুখানি

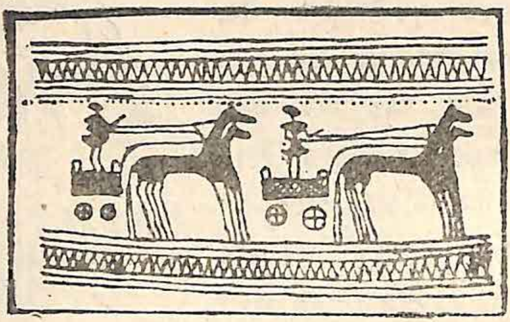

হোমার

মহাকাব্য রচিত হয়। গ্রীক মহাকবি হোমার এই মহাকাব্যদুটি রচনা করেছিলেন বলে প্রচারিত। এই মহাকাব্যদুটিতে সেকালের সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিচয় পাওয়া যায় বলে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত এই যুগকে হোমারিক যুগ বলে।

এইযুগে আগের ব্যবসাবাণিজ্য নষ্ট হওয়ায় লোকেরা চাষবাস ও পশুপালনের কাজে নিযুক্ত থাকত। সভ্যতার দিক দিয়ে এরা কিছুটা পিছিয়ে গিয়েছিল। জিনিসের বদলে জিনিস দিয়ে বেচাকেনা করত, পুরানো গোষ্ঠীজীবনের অনেক নিয়ম মানত। সমাজে ভদ্রবংশীয়দেরই প্রাধান্য ছিল, তারাই ছিল জমির মালিক। কৃষকশ্রেণীর কারো কারো এক-আধটু জমি ছিল ; ভূমিহীন কৃষকেরা অন্যের জমিতে মজুর খাটত। কিছু ক্রীতদাস ছিল—তারা বাড়ির চাকররূপে নিযুক্ত হত। প্রত্যেক উপজাতির নেতা প্রধান-পুরোহিতের কাজ করতেন ; যুদ্ধ পরিচালনাও করতেন। ভদ্র-পরিবারগুলির কর্তাদের নিয়ে যে সমিতি গঠিত হত, যুদ্ধ বা গুরুতর কাজে নেতাকে সেই সমিতির পরামর্শ নিতেই হত।

নগররাষ্ট্র—এর পরের যুগে (খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী)

হোমারিক যুগের নামমাত্র শহরগুলি সত্যিকারের শহর হয়ে উঠল। এক-একটা অঞ্চলের ব্যবসাবাণিজ্য ও রাজশক্তির কেন্দ্ররূপে এই শহরগুলি গড়ে উঠল। তাই প্রত্যেক গ্রীক শহরকে এক-একটি ছোট স্বাধীনরাষ্ট্র বলে মনে হত। তাই এগুলিকে বলা হয় নগররাষ্ট্র।



প্রাচীন গ্রীক পাত্রে নকশা

এরা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ করত। এদের মধ্যে মোটামুটি-ভাবে এক ধরনের গ্রীকভাষা প্রচলিত ছিল। পারস্পরিক মেলা-মেশার ফলে এক রাষ্ট্রের ভাল অভ্যাস, শিল্প বা বিদ্যা অন্য রাষ্ট্র গ্রহণ করত।

উপনিবেশ বিস্তার—এইসব নগররাষ্ট্র নানা দিকে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের ঐশ্বর্য বাড়াবার চেষ্টা করত। কিন্তু উপনিবেশ-গুলি তাদের নিয়মকানুন, সমাজব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, মুদ্রা, সবই নিজেদের ইচ্ছামত চালাত। নগররাষ্ট্রগুলি নিজেদের ব্যবসার ঘাঁটি করা, বাড়তি লোকজনের বসবাসের জায়গা করা ইত্যাদি নানা কারণে উপনিবেশ স্থাপন করত। এই যুগে প্রধানতঃ তিনটি অঞ্চলে গ্রীক-উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল :—(১) এসিয়া-মাইনরের উপকূল ও ঈজিয়ান-সাগরের দ্বীপগুলি। (২) ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম-অঞ্চল, এবং (৩) পূর্বদিকের প্রণালী-অঞ্চল ও কৃষ্ণসাগরের উপকূল।

অ্যাথেন্স ও স্পার্টা

নগররাষ্ট্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল অ্যাথেন্স ও স্পার্টা। অ্যাথেন্সে চাষবাসের সুবিধা না থাকায় বাইরে থেকে খাবার আনতে

হত। এই কারণে সাগরতীরে অবস্থিত অ্যাথেন্স জাহাজ চালানোর ব্যাপারে খুব উন্নতি করে। স্পার্টায় বেশ চাষবাস হত। স্পার্টার লোকেদের বলা হত স্পার্টান। এদেরই পূর্বপুরুষেরা ক্রীটের সভ্যতা ধ্বংস করেছিল।

অ্যাথেন্সের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা—অ্যাথেন্সের লোকেরা তিনশ্রেণীতে বিভক্ত ছিল :—সম্ভ্রান্ত, জনসাধারণ ও বিদেশী। সম্ভ্রান্তরা প্রথমদিকে দেশ শাসন করত। কৃষক, কারিগর, নাবিক, ব্যবসায়ী ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা কিছু সুবিধা পেলেও শাসনব্যাপারে কোনো অধিকার পেত না। বিদেশীদের কোনো নাগরিক বা রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। আর ক্রীতদাস শ্রেণীকে তো মানুষ বলেই গণ্য করা হত না।

কৃষকেরা স্বাধীন ও জমির অধিকার চেয়ে বিদ্রোহ করলে সোলন নামে এক বিচক্ষণ নেতা আইনের কিছু সংস্কার করলেন। এতে গরিবদের কিছুটা সুবিধা হল। স্থির হল, সম্ভ্রান্তদের বদলে 'চারশ জনের সমিতি' দেশ শাসন করবে। এরপর আইনকানুনের আরো পরিবর্তন হওয়ায় এবং মনীষী পেরিক্লিজ্ নানা নতুন আইনের ব্যবস্থা করায় 'জনসাধারণের' ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। রাষ্ট্র শাসন করত 'জনপ্রিয় পরিষদ'। অ্যাথেন্সবাসী সকলেরই ভোট দেবার ও ভোটে দাঁড়াবার অধিকার ছিল। সরকারী কাজে নিযুক্ত সবাই বেতন পেত। —তবে এই শাসনব্যবস্থার একটা বিরাট ত্রুটি ছিল—বিদেশী স্থায়ী বাসিন্দা, ক্রীতদাস এবং মেয়েদের ভোটের অধিকার ছিল না।

স্পার্টার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা—স্পার্টা ছিল গ্রীসের ল্যাকোনিয়া রাজ্যের প্রধান শহর। ল্যাকোনিয়ার মানুষেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল :—(ক) প্রথম শ্রেণীর লোকেরা স্পার্টান। এরা স্পার্টায় থাকত, ল্যাকোনিয়ার জমিগুলির এরাই মালিক ছিল, কিন্তু নিজেরা চাষবাস করত না ; (খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা স্পার্টার বাইরের অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসী। এরা স্বাধীন ছিল, কিন্তু শাসনব্যবস্থায় এদের অধিকার ছিল না। এদের অধিকাংশ ছিল

কারিগর। তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা ছিল দূরবর্তী অঞ্চলের প্রজা বা দাসশ্রেণীর লোক। এরা চাষবাস করত। এদের স্বাধীনতা বা রাজনৈতিক অধিকার ছিল না।

স্পার্টানরা নিজেদের বলত 'সমান মর্যাদার সম্প্রদায়'। দুজন রাজা এবং পরিবারকর্তাদের নিয়ে 'বয়োজ্যেষ্ঠ সমিতি' এই সম্প্রদায় শাসন করত। ভাল যোদ্ধা হওয়াই ছিল স্পার্টানদের লক্ষ্য। সাত বছর বয়সেই এদের শারীরিক শিক্ষা শুরু হত। কুড়ির বেশী বয়সের যুবকমাত্রই সৈন্য হয়ে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হত—একরকম খাবার খেত, সরলভাবে চলত, মিতব্যয়ী হত, নিয়মিত শরীরচর্চা ও অস্ত্রচর্চা করত, বড়দের সঙ্গে সবিনয়ে ও সংক্ষেপে কথা বলত। এসব সদ্‌গুণের ফলে তারা বিশাল ও দুর্ধর্ষ সৈন্যদল গঠন করল এবং বহু রাজ্য জয় করে দক্ষিণগ্রীসের শক্তিগুলিকে একত্র করল।

অ্যাথেন্স ও স্পার্টার যুদ্ধ—কিছুদিনের মধ্যে গ্রীসের প্রধান দুই শক্তি অ্যাথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে বিরাট যুদ্ধ বাধল। স্থলে অসুবিধা হলেও অ্যাথেন্স জলে অনেকগুলি যুদ্ধে জিতল এবং স্পার্টানদের অধীন নানা শহর দখল করল। বিপদ বুঝে স্পার্টানরা যুদ্ধের গতিকে উত্তরগ্রীসের স্থলভাগের দিকে চালিত করল এবং অ্যাথেন্সের অধীন কয়েকটি শহর দখল করল। এরপর উভয়পক্ষের সন্ধি হল।

কিন্তু অ্যালসিবিয়াডিজ্ নামে এক যুদ্ধপাগল নেতার উৎসাহে অ্যাথেন্সের নৌবাহিনী ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম-অংশে সিসিলি দ্বীপ দখল করতে গেল। সেখানে সিরাকিউজ নগরী অবরোধ করতেই স্পার্টানরা সিরাকিউজের সাহায্যে এগিয়ে এল। দুপক্ষের প্রচণ্ড যুদ্ধে অ্যাথেন্স দারুণভাবে পরাজিত হল। তাছাড়া গ্রীসেও স্পার্টানরা বহু স্থানে অ্যাথেন্সকে হারাল। এরপর পারস্য স্পার্টানদের দিকে যোগ দিল। স্পার্টানরা অ্যাথেন্সের নৌবাহিনী বিধ্বস্ত করে' অ্যাথেন্স শহর দখল করল (৪০৪ খ্রীঃ পূঃ)। অ্যাথেন্স চিরতরে ধ্বংস হল। কিন্তু ২৭ বছরের এই দীর্ঘ যুদ্ধ স্পার্টাকেও দুর্বল করে দিল।

নানাক্ষেত্রে অ্যাথেন্সের কৃতিত্ব

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে, বিশেষতঃ পেরিক্লিজের* আমলে অ্যাথেন্স রাজনৈতিক দিক ছাড়াও সাহিত্য, শিল্পকলা, ধর্মচিন্তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি করেছিল।

সাহিত্য—অ্যাথেন্সে বহু বিখ্যাত নাট্যকার অনেক নাটক রচনা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ইস্কিলাজ (এস্কাইলাজ্), সফোক্লিজ্, ইউরিপিডিজ্ ও অ্যারিস্টোফ্যানিজ্ খুবই প্রসিদ্ধ। ইস্কিলাজ্ ৮০ খানি, সফোক্লিজ্ ১২০ খানি এবং ইউরিপিডিজ্ ৯০ খানি নাটক লিখেছিলেন। দুঃখের বিষয়, এর মধ্যে অল্প কয়েকখানিই পাওয়া গেছে। অ্যারিস্টোফ্যানিজের ১১ খানি নাটক পাওয়া গেছে। এছাড়া হেরোডোটাস ও জেনোফন ইতিহাস লিখে বিখ্যাত হন। অ্যারিস্টট্‌ল তাঁর নানা গ্রন্থের জন্যে আজও অমর হয়ে আছেন।

শিল্পকলা—স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় অ্যাথেন্স খুব উন্নতি করেছিল। নাটক অভিনয়ের জন্যে বিরাট বিরাট নাট্যশালা তৈরি হয়েছিল। ৩০,০০০ দর্শক বসতে পারে, এমন নাট্যশালাও ছিল। বিরাট স্তম্ভের উপর ছাদ দিয়ে বড় সভাগৃহ ও প্রাসাদ তৈরি হত। পেরিক্লিজের সময় নানা দেশের বিখ্যাত স্থপতি ও ভাস্করেরা অ্যাথেন্সে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের তৈরী প্রাসাদ, দেবদেবী ও মানুষের মূর্তিগুলি ছিল অপূর্ব। ভস্মাধার, জলপাত্র, ফুলদানি ইত্যাদিতে সুন্দর ছবি আঁকার প্রথা ছিল।

পেরিক্লিজের উৎসাহে অ্যাথেন্সে যেসব স্থাপত্যকাজ হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে 'পার্থেনন' নামক সুবিশাল মন্দিরে অপূর্ব কারুকার্যশোভিত অ্যাথিনী বা অ্যাথিনা দেবীর মূর্তি গ্রীক স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

ধর্ম—অ্যাথেন্সে নানারকম পৌরাণিক দেবদেবীর পূজা প্রচলিত

---

* 'পেরিক্লিজ্' উচ্চারণে 'জ'-এর উচ্চারণ 'z'-এর মত। সফোক্লিজ্, অ্যারিস্টোফ্যানিজ, সক্র্যাটিজ ইত্যাদি শব্দের বেলায়ও তাই

ছিল। তার মধ্যে জিউস, অ্যাথিনী, ডায়োনিসাস ইত্যাদি দেবদেবী বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে এসব দেবদেবী বিখ্যাত থাকলেও, ধর্মজগতে নতুন চিন্তার সূত্রপাত হল। পেরিক্লিজের পণ্ডিতবন্ধু অ্যাক্স্যাগোর‍্যাস প্রচার করলেন, দেবদেবী ও তাঁদের কাহিনী সবই মিথ্যা—পৃথিবীতে আছে শুধু একটিমাত্র জীবনদাতা শক্তি। মনীষী সক্র্যাটিজ্ মানুষকে অন্ধের মত সবকিছু বিশ্বাস না করে প্রমাণের সাহায্যে সত্যকে যাচাই করে নিতে বলতেন। এঁদের চিন্তাধারা পরবর্তীকালে গ্রীকদের প্রভাবিত করেছিল।



প্রাচীন গ্রীকদেবী
অ্যাথিনী (পার্থেনন্)

অ্যাথেন্সের এই বিখ্যাত যুগে যেসব মনীষী জীবিত ছিলেন, তাঁদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

পেরিক্লিজ্ (খ্রী. পূ. ৪৯৫-৪২৯)—বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ এবং অসাধারণ বক্তা এই মনীষীর পরিচালনায় অ্যাথেন্সের অপূর্ব উন্নতি হয়। ইনি শাসনব্যবস্থার অনেক সুপরিবর্তন করেছিলেন। দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে ইনি শাসকমণ্ডলীর নেতা ছিলেন। জনসাধারণ এঁকে দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধাভক্তি করত। এঁর পরিচালনায় ভূমধ্যসাগরের বিস্তৃত অঞ্চলে অ্যাথেন্সের সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। এঁর উৎসাহে নানা দেশ থেকে স্থপতি ও ভাস্করেরা এসে অ্যাথেন্সে নানা সৌধ, নাট্যশালা ও মূর্তি নির্মাণ করেছিল।



পেরিক্লিজ্

সফোক্লিজ্ (খ্রী. পূ. ৪৯৬-৪০৬)—ইনি একজন অসাধারণ কবি ও নাট্যকার ছিলেন। শোনা যায়, ইনি অন্তত ১২০ খানি নাটক লিখেছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে মাত্র সাতখানি পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে 'রাজা অয়দি-পাউস' খুব বিখ্যাত। আজ পর্যন্ত তাঁর সমকক্ষ নাট্যকার পৃথিবীতে অল্পই জন্মেছেন।



সক্র্যাটিজ্

সক্র্যাটিজ (খ্রী.পূ. ৪৬৯-৩৯৯) —ইনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ একজন চিন্তাবিদ্ ও দার্শনিক। ইনি খুব সাদাসিধেভাবে দিন কাটাতেন। কিছু লোকজন জড়ো করে তাদের কাছে বক্তৃতা দিয়ে নানা জ্ঞানের কথা বোঝানোই ছিল তাঁর একমাত্র কাজ। তিনি বলতেন, যাচাই না করে কোনো কিছু বিশ্বাস করা ঠিক নয়। বলতেন, সত্য জ্ঞানই হল একমাত্র পুণ্য। সাধারণ লোক তাঁর কথা বুঝত না। শুধু কিছু জ্ঞানলোভী যুবক তাঁর ভক্ত ছিল। যা-তা বলে তিনি যুবকদের নষ্ট করে ফেলছেন এই অভিযোগে তাঁর শাস্তি হয় যে, তাঁকে বিষ খেয়ে মরতে হবে। সক্র্যাটিজ্ হাসিমুখে বিষ খেয়ে মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে প্লেটো, জেনোফন, ইসক্র্যাটিজ্ ইত্যাদি বিখ্যাত ছিলেন।



হেরোডোটাস

হেরোডোটাস (খ্রী. পূ. পঞ্চম শতাব্দী)—হেরোডোটাস সর্বপ্রথম ইতিহাস রচনা করেন। তাই তাঁকে 'ইতিহাসের জনক' বলা হয়। ইনি গ্রীস ও পারস্যের যুদ্ধ নিয়ে নয় খণ্ডে 'হিস্ট্রি' নামে বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। শুধু এই কাহিনী নয়, তাঁর বইটি থেকে প্রাচীন-কালের মিশর পারস্য ইত্যাদি দেশ সম্পর্কে প্রচুর বিষয় জানা যায়।

প্লেটো—(৪২৭-৩৪৭ খ্রীঃ পূঃ)—প্লেটো মনীষী সক্র্যাটিজের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। সক্র্যাটিজের প্রভাবে প্লেটো সমাজ, মানুষ, পৃথিবী ও বিশ্বজগতের রহস্য নিয়ে নানারকম নতুন দার্শনিক চিন্তা করেছিলেন। তিনি 'অ্যাকাডেমি নামে এক বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং নিজে সেখানে পড়াতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান ন'শ বছর টিকে ছিল। যুদ্ধ, হিংসা রেষারেষি সেই সময় ও গোটা গ্রীসকে অশান্ত করে তুলেছিল। কেমন করে আদর্শ নগর-রাষ্ট্র গড়ে তোলা যায়, কেমন করে মানুষ সেইরকম নগররাষ্ট্রে সুন্দর এবং আদর্শ জীবনযাপন করতে পারে, প্লেটো এই নিয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'রিপাব্‌লিক' লিখেছিলেন। ঐ রকম রাষ্ট্রের নিয়মকানুন কেমন হবে, তা নিয়ে তিনি 'লজ' (= আইন) নামেও একটি গ্রন্থ লিখতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু বইটি শেষ করতে পারেন নি।


প্লেটো

মানুষ সমাজকে এবং রাষ্ট্রকে নিজেদের ইচ্ছামতো গড়ে তুলতে পারে, প্লেটোই সর্বপ্রথম সেকথা মানুষকে বলেছেন। তিনিই প্রথম মানুষকে শিখিয়েছেন, 'এই যেসব জিনিস তোমাদের দুর্দশা সৃষ্টি করে, এগুলির অধিকাংশই তোমরা এড়াতে পারো ; এই যেসব জিনিস তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করছে, এগুলির অধিকাংশই তোমরা উলটে দিতে পারো।"

অ্যারিস্টট্‌ল—(৩৮৪—৩২২ খ্রীঃপূঃ) অনেকের মতে অ্যারিস্টট্‌ল্ প্রাচীন গ্রীসের সবচেয়ে বড় চিন্তাবিদ্ পণ্ডিত এবং প্রতিভাবান্‌পুরুষ

ছিলেন। ইনি ম্যাসিডনিয়ার রাজার চিকিৎসকের ছেলে ছিলেন এবং প্লেটোর কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন। ইনি বহু বছর দিগ্বিজয়ী অ্যালেকজ্যাণ্ডারের গৃহশিক্ষক ছিলেন। প্লেটোর মৃত্যুর পরে ইনি অ্যাথেন্সের লাইসিঅ্যাম নামে এক বাগানে এক বিখ্যাত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ইনি সক্র্যাটিজ্ এবং প্লেটোকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু তাঁদের নানা মতের সমালোচনা এবং নিন্দাও করতেন। অ্যারিস্টট্ল্ এমন অনেক নতুন চিন্তাধারা প্রচার করেন, যেগুলি পরবর্তী কালে পণ্ডিতদের কাজকর্মকে খুবই প্রভাবিত করেছিল। প্লেটো নগররাষ্ট্র নিয়ে চিন্তা করেছিলেন; কিন্তু অ্যারিস্টট্ল্ ম্যাসিডনের সাম্রাজ্যবিস্তার ও অ্যালেকজ্যাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের সময় বেঁচেছিলেন। তাই বিরাট রাজ্য ও সাম্রাজ্যে কিভাবে সুশাসন চালানো যায়, অ্যারিস্টটল্ তা নিয়ে বহু নতুন কথা চিন্তা করেছিলেন। তিনি তর্ক শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, বিজ্ঞান, দর্শন, শিক্ষাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ছন্দ, সাহিত্য ইত্যাদি বহু বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন। নানা বিষয় পড়াবার ক্ষেত্রে আজও অ্যারিস্টট্লের মূল্যবান্ মতামত আলোচনা করা হয়। তিনি সাহিত্য সম্পর্কে 'পোয়েটিক্স্' নামে যে অসাধারণ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তা আজও পৃথিবীবিখ্যাত। আলেকজ্যাণ্ডারের সমর্থন থাকায়, প্রায় এক হাজার কর্মীকে দিয়ে তিনি এসিয়া ও গ্রীসে যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাজ চালিয়েছিলেন, মানুষের ইতিহাসে সেরকম বিরাট বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাজ তার আগে কখনো হয়নি।

এঁরা ছাড়াও সেযুগের অ্যাথেন্সে বহু বিখ্যাত লোক বাস করতেন।

ম্যাসিডন

গ্রীসের উত্তরদিকে ম্যাসিডনিয়া নামে এক ছোট রাজ্য ছিল। এখানকার রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ গ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীকদের অনুকরণে এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তুললেন। তারপর অ্যাথেন্স ও অন্য দু-একটি রাজ্য ছাড়া বাকি গ্রীসকে তাঁর অধীনে ঐক্যবদ্ধ করলেন। পারস্যের প্রতি তখন সব গ্রীক জাতিই ক্রুদ্ধ ছিল। ফিলিপ পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলেন। কিন্তু তিনি

হঠাৎ ঘাতকের হাতে নিহত হলেন। তাঁর কুড়ি বছর বয়স্ক ছেলে অ্যালেকজ্যাণ্ডার তাঁর সিংহাসনে বসলেন।

অ্যালেকজ্যাণ্ডার

অ্যালেকজ্যাণ্ডার অল্প বয়স থেকে যুদ্ধে সেনাপতিত্ব করতেন। তিনি প্লেটোর শিষ্য মনীষী অ্যারিস্টট্‌লের কাছে লেখাপড়া শিখেছিলেন এবং সাহিত্যে তাঁর খুব অনুরাগ ছিল। প্রথমে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিলেও প্রবলপ্রতাপে তিনি সেই বিদ্রোহ দমন করলেন। তারপর পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করলেন। তাঁর সৈন্য-বাহিনী খুব বিশাল ছিল না। কিন্তু ৩০০০০ পদাতিক, ৫০০০ অশ্বারোহী ও ১৫০ থেকে ১৬০ খানি যুদ্ধজাহাজ নিয়ে গঠিত এই বাহিনী খুব সুশৃঙ্খল ও যুদ্ধনিপুণ ছিল। ৩৩৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি চিরশত্রু পারস্যকে আক্রমণ করলেন এবং তিন বছরের মধ্যে তিনটি যুদ্ধে পারস্যসম্রাট তৃতীয় দারায়ুসকে পরাস্ত করে বিরাট পারস্য সাম্রাজ্য দখল করলেন। এর মধ্যে তিনি মিশরও জয় করেছিলেন। তারপর পলাতক দারায়ুসের সন্ধানে বর্তমানের উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তানে গিয়ে পৌঁছলেন। এখানে তিনি দু-বছর ছিলেন। এ-সময় ভারতবর্ষের অসাধারণ ঐশ্বর্যের কথা শুনে তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন।



অ্যালেকজ্যাণ্ডার

অ্যালেকজ্যাণ্ডারের ভারতবর্ষ আক্রমণ

পারস্যের পূর্বদিকের পার্বত্য পথে অগ্রসর হয়ে, পথে অনেকগুলি নগর জয় করে, অ্যালেকজ্যাণ্ডার ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পৌঁছলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ তখন সভ্যতার দিক দিয়ে বেশ

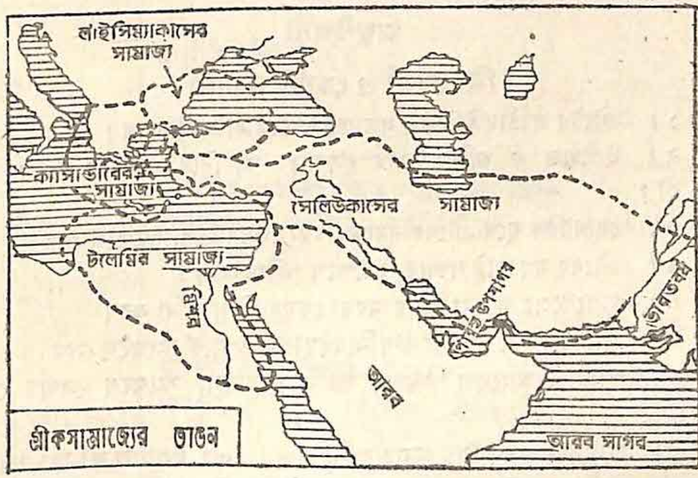
উন্নত ছিল, কিন্তু অসংখ্য ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ঘোর বিপদের দিনেও তারা এক হল না। তাই অ্যালেকজ্যাণ্ডারের পক্ষে অগ্রসর হবার সুবিধা হল। তক্ষশিলার রাজা অম্ভি এবং আর এক সীমান্তরাজ্যের রাজা শশিগুপ্ত বিশ্বাসঘাতকতা করে অ্যালেকজ্যাণ্ডারের অধীনতা স্বীকার করলেন। অশ্বায়ন, অশ্বকায়ন ইত্যাদি উপজাতি গ্রীক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল, কিন্তু পরাস্ত হল। অ্যালেকজ্যাণ্ডার ৩২৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সিন্ধু নদী অতিক্রম করলেন।

অ্যালেকজ্যাণ্ডার ঝিলাম নদী অতিক্রম করার পর পৌরব (বা পুরু) নামে এক রাজা তাঁর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করলেন। কিন্তু যুদ্ধের আগের রাতে ঝড়বৃষ্টির ফলে কাদা হওয়ায় তাঁর সেনাবাহিনীর ঘোড়া, রথ, হাতী ইত্যাদির এগোতে অসুবিধা হল। তার উপর গ্রীক সৈন্যদের ঝাঁকে ঝাঁকে তীর এসে আহত করায় হাতী ও ঘোড়াগুলি ক্ষেপে গিয়ে নিজেদের দলের বহু সৈন্যকেই আঘাত করল এবং মেরে ফেলল। সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেও পুরু দুর্ভাগ্যক্রমে পরাস্ত হলেন। দেহের বহু স্থানে আহত হয়ে বন্দী অবস্থায় তিনি অ্যালেকজ্যাণ্ডারের কাছে গেলেন। অ্যালেকজ্যাণ্ডার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার কাছে কেমন ব্যবহার পেতে চান?' পুরু উত্তর দিলেন, 'রাজার মত'। অ্যালেকজ্যাণ্ডার এই বীরের প্রতি সম্মান দেখালেন এবং তাঁকে আবার রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন। তারপর সিন্ধু নদীর উপনদীগুলির মধ্যবর্তী বহু রাজ্য জয় করে পুরুকে ঝিলাম থেকে বিপাশা পর্যন্ত অঞ্চলের রাজা নিযুক্ত করলেন।

এবার বিপাশা নদী পার হয়ে তিনি পূর্বদিকে এগোতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর সৈন্যরা কিছুতেই আর এগোতে চাইল না। সম্ভবতঃ তারা মগধরাজ্যের নন্দবংশের বিশাল সৈন্যবাহিনীর কথা ও বাংলার 'গঙ্গরিডাই' নামক পরাক্রান্ত জাতির কথা শুনেই ভয় পেয়েছিল। অগত্যা অ্যালেকজ্যাণ্ডার ফেরবার আদেশ দিলেন (৩২৬ খ্রী. পূ.)। ১০০০ নৌকার বাহিনী নিয়ে সিন্ধুনদী দিয়ে দক্ষিণে যাবার পথে মালব, ক্ষুদ্রক ইত্যাদি উপজাতি তাঁকে একত্রে বাধা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তার আগেই তিনি মালব উপজাতিকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত

পর ব্যাবিলনে পৌছলেন। তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য তখন ইউরোপের অ্যাড্রিয়াটিক সাগর থেকে পূর্বে ভারতবর্ষ এবং উত্তরে ককেসাস পর্বত থেকে দক্ষিণে নীলনদী পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু ৩২৩ গ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৩২ বা ৩৩ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় এই বিশাল সাম্রাজ্য তিনি ভোগ করতে পারলেন না।

গ্রীক সাম্রাজ্যের পতন—অ্যালেকজ্যাণ্ডার বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করলেও সুশাসনের ব্যবস্থা করতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর



গ্রীকসাম্রাজ্যের ভাঙন (গ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষে)

প্রধান সেনাপতিদের মধ্যে ঝগড়া লাগল এবং এই সেনাপতিরা সাম্রাজ্যের এক এক অংশ দখল করলেন। সবচেয়ে বড় অংশ (তার মধ্যে পারস্য ও ভারত ছিল) এল সেলুকাসের অধীনে। সেনাপতি অ্যান্টিগোনাস ম্যাসিডনিয়ার, ও সেনাপতি টলেমি মিশরের রাজা হলেন। গ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষে সাম্রাজ্যে আরো ভাঙন ধরল।

রোমানদের গ্রীস জয়—অনেকদিন ধরেই পশ্চিমের রোমান শক্তি ভূমধ্যসাগরে ক্ষমতা বাড়াবার চেষ্টা করছিল। পূর্বাঞ্চলে রোমানদের প্রধান শত্রু ছিল ম্যাসিডনিয়া। গ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে রোমানরা পরপর দুটি যুদ্ধ করে ম্যাসিডনিয়াকে দুর্বল করে ফেলল। তারপর ১৯৬ গ্রীষ্টপূর্বাব্দে তৃতীয় যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে ম্যাসিডনিয়া অধিকার করল। এককালের মহাপ্রতাপশালী ম্যাসিডনিয়া রোমানশাসিত একটি রাজ্যে পরিণত হল।

এক নজরে (১) ক্রীটের উন্নত ঈজিয়ান সভ্যতা (নোসস্) এবং গ্রীক আক্রমণে তার পতন। (২) মিসেনীয় সভ্যতার প্রসার, ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যদের যুদ্ধবিগ্রহ—ট্রয়ের যুদ্ধ (হোমারের ইলিয়াড ও ওডিসি)। হোমারিক যুগের সভ্যতা। (৩) নগর-রাষ্ট্র (৪) উপনিবেশ বিস্তার (৫) অ্যাথেন্স ও স্পার্টার প্রাধান্য ; এই দুই রাজ্যের সংঘর্ষ (৬) সাহিত্য, শিল্পকলা, ধর্মচিন্তা ইত্যাদিতে অ্যাথেন্সের উন্নতি (বহু মনীষীর কীর্তি—পেরিক্লিজ্, সফোক্লিজ্, সক্র্যাটিজ্, হেরোডোটাস, প্লেটো, অ্যারিস্টট্ল্। (৭) ম্যাসিডনিয়া—অ্যালেকজ্যাণ্ডারের দিগ্বিজয় ও ভারতবর্ষ অভিযান (৮) গ্রীক সাম্রাজ্যের পতন (৯) রোমানদের গ্রীস বিজয়।

অনুশীলনী

নিবন্ধধর্মী ও ছোটউত্তরধর্মী

১। ক্রীটের প্রাচীন ঈজিয়ান সভ্যতা সম্পর্কে যা জান, লেখ।

২। ইলিয়াড ও ওডিসি কার লেখা? কী নিয়ে লেখা? হোমারিক যুগ কী?

৩। হোমারিক যুগে গ্রীসের সমাজব্যবস্থা কেমন ছিল, সংক্ষেপে লেখ।

৪। গ্রীসের নগররাষ্ট্র সম্পর্কে সংক্ষেপে পরিচয় দাও।

৫। অ্যাথেন্সের অধিবাসীদের অবস্থা কেমন ছিল, বর্ণনা কর।

৬। গ্রীসের নগররাষ্ট্রগুলির উপনিবেশস্থাপন সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

৭। স্পার্টা ও অ্যাথেন্স কিভাবে উন্নতি করেছিল, সংক্ষেপে লেখার চেষ্টা কর।

৮। অ্যাথেন্স ও স্পার্টার যুদ্ধের বর্ণনা দাও। এর ফলাফল কী হয়েছিল?

৯। সাহিত্য ও শিল্পকলায় অ্যাথেন্সের যে উন্নতি হয়েছিল, তার পরিচয় দাও।

১০। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও:—সফোক্লিজ্, পেরিক্লিজ্, সক্র্যাটিজ, হেরোডোটাস, প্লেটো, অ্যারিস্টট্ল।

১১। সংক্ষেপে অ্যালেকজ্যাণ্ডারের ভারত আক্রমণের বিবরণ দাও।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। **শূন্যস্থান পূরণ কর:**—ক্রীট —— সাগরের একটি দ্বীপ। —— সভ্যতা ক্রীটের সভ্যতাকে অধিকার করেছিল। হোমারের লেখা মহাকাব্য-দুটির নাম —— এবং ——। গ্রীসের নগররাষ্ট্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল —— ও ——। অ্যাথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে যুদ্ধ চলেছিল —— বছর ধরে এবং শেষ পর্যন্ত — জয়ী হয়। —— ছিলেন ইতিহাসের জনক। অ্যালেকজ্যাণ্ডারের নিজের রাজ্য ছিল ——।

২। **এক কথায় উত্তর দাও:**—অ্যালেকজ্যাণ্ডারের মৃত্যুর পর কে মিশরের রাজা হয়েছিলেন? ভারতে অ্যালেকজ্যাণ্ডারের সঙ্গে কার সব চেয়ে বড় যুদ্ধ হয়েছিল? ইলিয়াড কে রচনা করেন? নোসস্ শহরে যে প্রাচীন

লোহাযুগের সমাজঃ গ্রীস

খ্রীষ্টপূর্ব	
২৫০০	ক্রীটের সভ্যতা চলছে।
১৩০০	
১২০০	ট্রয়ের যুদ্ধ
	হো মা রি ক যুগ
৮০০	
	নগররাষ্ট্রের সৃষ্টি
৬০০	
৫০০	পেরিক্লিজ্—নানা ক্ষেত্রে অ্যাথেন্সের উন্নতি সফোক্লিজ, ইস্কিলাস্, ইউরিপিডিজ্, অ্যারিস্টোফ্যানিজ্, সক্র্যাটিজ, হেরোডোটাস
	অ্যাথেন্স ও স্পার্টার যুদ্ধ (৪৩১-৪০৪)। অ্যাথেন্সের পরাজয়, প্লেটো। জেনোফন, ইসক্র্যাটিজ্
৪০০	
	অ্যারিস্টট্ল
	ম্যাসিডনিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ (৩৫৯-৩৩৬) **অ্যালেকজ্যাণ্ডারের দিগ্বিজয়** (৩৩৫-৩২৫) (ভারতবর্ষে অভিযান—৩২৭-৩২৫) অ্যালেকজ্যাণ্ডারের মৃত্যু—৩২৩
৩০০	**গ্রী ক সা ম্রা জ্যে র অ ব ন তি**
	” ” ”
	” ” ”
২০০	
খ্রী. পূ.)	রোমান অধিকার—১৯৬

সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার নাম কী? গ্রীক জাতির পূর্বপুরুষ কারা? কারা নিজেদের 'সমান মর্যাদার সম্প্রদায়' বলত? ইউরিপিডিজ্‌ কী লেখার জন্যে বিখ্যাত? অ্যালেক্‌জ্যাণ্ডার যে পারস্যসম্রাটকে হারান, তাঁর নাম কী?

৩। **শুদ্ধ হলে ✓, অশুদ্ধ হলে × চিহ্ন দাও:**—৩০০০০ দর্শক বসতে পারত এমন নাট্যশালাও অ্যাথেন্সে ছিল। হোমার 'নোসস্‌, নামে একটি মহাকাব্য লেখেন। সফোক্লিজ্‌ ছিলেন স্পার্টার সেনাপতি। অ্যাথেন্সকে হারিয়ে শেষ পর্যন্ত স্পার্টা জয়ী হয়। স্পার্টানরা চাষবাস করত না। দ্বিতীয় ফিলিপ এসিয়া-মাইনরে রাজত্ব করতেন।

৪। **যার সঙ্গে যার মিল, লাইন টেনে যোগ কর:**—

ক্রীট	দ্বিতীয় ফিলিপ
অ্যাথেন্স	সক্র্যাটিজ্‌
ম্যাসিডনিয়া	নোসস্‌
ওডিসি	তৃতীয় দারায়ুস
পারস্য	হোমার

হাতের কাজ

১। গ্রীস ও তার সাগর-অঞ্চল আঁক। তাতে এগুলি দেখাও:—ক্রীট, ম্যাসিডনিয়া, অ্যাথেন্স, স্পার্টা, ঈজিয়ান সাগর, আয়োনিয়ান সাগর।

২। পাকিস্তান সহ ভারতবর্ষের পশ্চিম-অঞ্চলের মানচিত্র এঁকে এগুলি দেখাও:—সিন্ধুনদী ও তার পাঁচটি উপনদী, অ্যালেকজ্যাণ্ডারের ভারতবর্ষ অভিযানের পথ (কালো মোটা দাগ দিয়ে দেখাও), তক্ষশিলা।

৩। রোম

রোমের উত্থান—অ্যালেকজ্যাণ্ডারের মৃত্যুর পর ইউরোপে রোম সাম্রাজ্য খুব প্রবল হয়ে ওঠে। সম্ভবতঃ আরো তিন-চার শ বছর আগে রোম নগররাষ্ট্র রূপে গড়ে উঠেছিল। রোমের কাছাকাছি প্রচুর উর্বর জমি ছিল। সেইসব জমির ফসলে রোম নগরীর উন্নতি ঘটেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে রোম কাছাকাছি অনেকগুলি নগরী অধিকার করে সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করল। বহু বছর ধরে নানা ট্রাইবের সঙ্গে যুদ্ধ করে অবশেষে ইটালির এক বিরাট অঞ্চল দখল করল। ইটালির দক্ষিণে তখনো গ্রীক প্রভাব ছিল। তারা বহু বছর রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল বটে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের হারিয়ে খ্রীষ্টপূর্ব

তৃতীয় শতকে রোম সমগ্র ইটালির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করল। তারপর ভূমধ্যসাগরের গোটা অঞ্চলে সাম্রাজ্যবিস্তারে অগ্রসর হল।

কার্থেজের সঙ্গে সংঘর্ষ—ইটালির পশ্চিমে ও দক্ষিণে ভূমধ্য সাগরের যে অঞ্চল, সেখানে তখন উত্তর-আফ্রিকার উপকূলে অবস্থিত পরাক্রান্ত কার্থেজ রাজ্য কর্তৃত্ব করছে। এই নগরী রোমের অনেক আগে থেকেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। উপকূলে অবস্থিত হওয়ায় বহু দেশের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য করে কার্থেজ যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। অনেক উর্বর অঞ্চল ছাড়াও নৌ-শক্তির সাহায্যে ইটালির কাছাকাছি অনেকগুলি দ্বীপে উপনিবেশও স্থাপন করেছিল। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় দ্বীপ সিসিলি ছিল ইটালির দক্ষিণে—কার্থেজ আর ইটালির মাঝামাঝি। এই দ্বীপের প্রায় সবটাই কার্থেজের দখলে ছিল—একমাত্র সিরাকিউজ নগরী ছাড়া। রোমের সৈন্যরা সিরাকিউজ দখল করতে আসতেই কার্থেজের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে গেল (খ্রীঃ পূঃ ২৬৪)। এই যুদ্ধ চলেছিল তেইশ বছর ধরে। শক্তিশালী নৌ-বাহিনী না থাকায় প্রথম দিকে রোমের কিছুটা অসুবিধা হলেও শেষ পর্যন্ত রোমই বিজয়ী হল। সিসিলি রোমের অধীনে গেল। কিছুদিন পর কার্থেজের অধীনে আরো দুটি বড় দ্বীপও রোম জোর করে দখল করে নিল।

এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে এলেন কার্থেজের প্রধান সেনাপতি হ্যামিলকার। কিন্তু অকালে মৃত্যু হওয়ায় তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হল না। তারপর কার্থেজের প্রধান সেনাপতি হলেন হ্যামিলকারের ছেলে হানিবল। সতেরো বছর ধরে প্রবল বিক্রমে জলে ও স্থলে অসংখ্য যুদ্ধ করে রোমের সেনাবাহিনীকে তিনি ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। দেশপ্রেমিক ও যোদ্ধা রূপে তাঁর নাম ইতিহাসবিখ্যাত হয়ে আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি রোমান সেনাপতি সিপিওর কাছে পরাজিত হন (খ্রীঃ পূঃ ২০২)। এর ফলে রোমানসাম্রাজ্য ভূমধ্যসাগরের অঞ্চলে সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠল।

পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কার্থেজ আবার সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। রোমান

শক্তি আবার কার্থেজ আক্রমণ করল (খ্রীঃ পূঃ ১৪৯) এবং তিন বছরের মধ্যে কার্থেজ দখল করল। ষোল দিন ধরে আগুনে পুড়িয়ে অবশেষে কার্থেজ নগরীকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হল।

অতিপ্রাচীন রোমের সমাজ, প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান—বহু কাল থেকেই রোমানসমাজ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এখানকার আদি ল্যাটিন-অধিবাসীরা উর্বর জমিগুলি দখল করে ধনী হয়ে উঠেছিল। শাসন-ব্যাপারে রাজাকে পরামর্শ দেবার জন্যে **'সেনেট'** নামে যে বয়োজ্যেষ্ঠসমিতি ছিল, সেখানে এদেরই কর্তৃত্ব ছিল। এই ধনী শ্রেণীর লোকদের বলা হত **প্যাট্রিসিয়ান**। ল্যাটিন ছাড়া বাকি লোকেরা ছিল মাঝারি বা গরিব কৃষক, ব্যবসায়ী, কারিগর, বিদেশী ইত্যাদি। এদের বলা হত **প্লেবিয়ান**।

শাসনবিভাগের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা ছিলেন **দুজন কন্‌সাল**। নগরবাসীদের প্রতিনিধি নিয়ে 'কমিশিয়া কিউরিয়েটা' নামে একটি পরিষদ ছিল। কন্‌সাল-পদ প্যাট্রিসিয়ানরাই পেত ; কমিশিয়াতেও তাদেরই প্রাধান্য ছিল। কিন্তু সচ্ছল প্লেবিয়ানরা এদের সমান অধিকারের জন্যে তুমুল আন্দোলন চালাল। তার ফলে রাজা সারভিয়াস 'কমিশিয়া সেঞ্চুরিয়েটা' নামে এক পরিষদ করলেন। ফলে সচ্ছল প্লেবিয়ানদের কিছু অধিকার বাড়ল। রাজযুগের শেষ রাজা টারকুইন ছিলেন খুব অত্যাচারী ও অহংকারী। দেশের লোকেরা তাঁকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়ে রোমে **প্রজাতন্ত্র** বা **সাধারণতন্ত্র** প্রতিষ্ঠা করল। শাসনের সর্বোচ্চ কর্তা হল 'সেনেট'।

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম থেকে তৃতীয়, এই দুই শতাব্দী ধরে প্যাট্রিসিয়ান এবং প্লেবিয়ানদের মধ্যে সংঘর্ষ চলেছিল। সাধারণ প্লেবিয়ানদের দাবি ছিল আরো বেশী জমি। সচ্ছল প্লেবিয়ানদের দাবি ছিল প্যাট্রিসিয়ানদের সমান ক্ষমতা।

আন্দোলনের ফলে ক্রমেই প্লেবিয়ানরা নতুন অধিকার পেতে লাগল। প্লেবিয়ানদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে নজর রাখবার জন্যে 'ট্রিবিউন' নামে কতকগুলি উচ্চপদ সৃষ্টি হল। প্লেবিয়ানদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই এই পদ পেত। 'বারো দফা' নামে কতকগুলি নতুন

আইনে প্লেবিয়ানদের অধিকার আরও বাড়ল। প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান ছেলেমেয়ের বিয়ে আইনসম্মত হল। ক্রমে আইন হল, প্লেবিয়ানরাও কন্‌সাল এবং অন্যান্য উচ্চ পদে নিযুক্ত হতে পারবে। এইভাবে ধনী প্লেবিয়ান এবং প্যাট্রিসিয়ানদের পার্থক্য প্রায় ঘুচে গিয়ে নতুন ধরনের এক অভিজাত শ্রেণীর সৃষ্টি হল। সমস্ত শাসনক্ষমতা এই শ্রেণীর হাতে গেল। কিন্তু গরিব প্লেবিয়ানদের অবস্থা আগের চেয়ে বরং আরো খারাপ হল।

রোমান নাগরিকত্ব, ক্রীতদাসত্ব—কার্থেজের অধিকারভুক্ত সমগ্র অঞ্চল দখল করার পর রোমানরা ম্যাসিডনিয়া এবং গ্রীস দখল করল। এত যুদ্ধে জয়লাভ করায় রোমের ঐশ্বর্য সহস্রগুণে বেড়ে গেল। ফলে রোমান নাগরিকদের জীবন সুখে ও বিলাসে ভরে গেল। রোমে কৃষকদের মধ্য থেকেই সৈন্য সংগ্রহ করা হত। তাদের অনেকে যুদ্ধে মারা যেত, বাকিরা অনেকে যুদ্ধে নিযুক্ত থাকত। কৃষকদের বদলে ক্রীতদাসদের চাষের কাজে লাগান হত। অসংখ্য যুদ্ধে জয়লাভ করে রোমান সেনাপতিরা পরাজিত দেশের লোকদের ধরে এনে ক্রীতদাসের বাজারে বিক্রি করত। লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাসে ইটালি ভরে গিয়েছিল। রোমান নাগরিকেরা এদের অল্পদামে কিনে চাষ করাত এবং সবরকম পরিশ্রমের কাজ করাত। এইভাবে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোমের সমাজ প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত হল—রোমান নাগরিক এবং ক্রীতদাস।

ক্রীতদাসবিদ্রোহ স্পার্টাকাস)—সুখী ও বিলাসী রোমান নাগরিকদের অত্যাচারে জর্জরিত ক্রীতদাসরা অবশেষে দিকে দিকে বিদ্রোহ শুরু করল। প্রথম বিদ্রোহ দেখা দিল সিসিলিতে। ইউনুস নামে এক সিরীয় ক্রীতদাস এবং ক্লেয়ন নামে এক মেষপালকের নেতৃত্বে ক্রীতদাসরা প্রায় সমগ্র সিসিলি দখল করল। তারপর ইউনুসকে রাজা বলে ঘোষণা করল। অবশেষে বিশাল রোমান সেনাবাহিনী এসে চার বছর যুদ্ধ করে, অতি নিষ্ঠুর ভাবে সেই বিদ্রোহ দমন করল। তিরিশ বছর পর ক্রীতদাসরা আবার

বিদ্রোহ করে’ সিসিলি দখল করে। কিন্তু এবারেও বিশাল রোমান সেনাবাহিনী বিদ্রোহ দমন করল।

বিদ্রোহের ঢেউ এসে রোমেও লাগল। গ্রাক্কাস-পরিবারের ছুভাই দরিদ্র কৃষকদের জন্যে জমি এবং আর্থিক সুবিধার দাবি তুলে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করলেন। কিন্তু ধনী সিনেট-সদস্যদের চক্রান্তে বড় ভাই টাইবেরিয়াস খুন হলেন। ছোট ভাই গেইয়াস সৈন্য সংগ্রহ ক’রে বিদ্রোহ চালালেন। ইটালীয়দের জন্যে তিনি রোমান নাগরিকদের মত সুবিধা ও অধিকার দাবি করেছিলেন। অবশেষে রোমান সৈন্যরা বিদ্রোহ দমন করল। গেইয়াস মৃত্যু বরণ করলেন (খ্রী. পূ. ১২১)।

এর পঞ্চাশ বছর পর বীর যোদ্ধা স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে ইটালিতে সবচেয়ে বড় ক্রীতদাসবিদ্রোহ দেখা দিল। দক্ষিণ-ইটালির কাপুয়া শহরে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র হল। কিন্তু খবর ফাঁস হয়ে গেল। সত্তর-আশী জন সৈন্য নিয়ে স্পার্টাকাস নিভন্ত আগ্নেয়গিরি ভিসুভিয়াসে শিবির স্থাপন করলেন। রোমান সৈন্যরা ভিসুভিয়াস থেকে নামবার রাস্তা দখল করল। আঙুরলতা পাকিয়ে তার সাহায্যে ঝুলে স্পার্টাকাস সৈন্যসহ রাত্রির অন্ধকারে রোমান শিবিরের কাছে পৌছলেন। তারপর হঠাৎ রোমান শিবির আক্রমণ করে তছনছ করে দিলেন। উত্তর-ইটালিতে স্পার্টাকাসের সঙ্গে রোমানসৈন্যদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। এ-যুদ্ধে জয়লাভই ছিল স্পার্টাকাসের সবচেয়ে বড় জয়। এরপর স্পার্টাকাস সসৈন্যে রোমের দিকে অগ্রসর হলেন। স্পার্টাকাসের সৈন্যসংখ্যা তখন ১,২০০০০। রোম-নগরীতে সকলেই সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু স্পার্টাকাস রোম পার হয়ে সিসিলির পথে এগোলেন। যুদ্ধজাহাজ নেই, তাই তাঁর সৈন্যরা ভেলায় পার হবার চেষ্টা করল। কিন্তু প্রচণ্ড ঝড়ে ভেলাগুলি ধ্বংস হয়ে গেল। রোমানসৈন্যদের সঙ্গে প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করে স্পার্টাকাসের বাহিনী পরাজিত হল এবং স্পার্টাকাস নিহত হলেন (খ্রী. পূ. ৭১)। এরপর নিষ্ঠুরভাবে ক্রীতদাসবিদ্রোহ দমন করা হল। ছ হাজার ক্রীতদাসকে কাপুয়া থেকে রোম পর্যন্ত বিস্তৃত পথের ধারে ক্রুশবিদ্ধ করে রেখে

দেওয়া হল। রোমান নাগরিক এবং ক্রীতদাস শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক কতটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, স্পার্টাকাসের এই দুর্দান্ত বিদ্রোহ এবং ছ-হাজার ক্রীতদাসকে এ-রকম নৃশংসভাবে মেরে ফেলাই তার প্রমাণ।

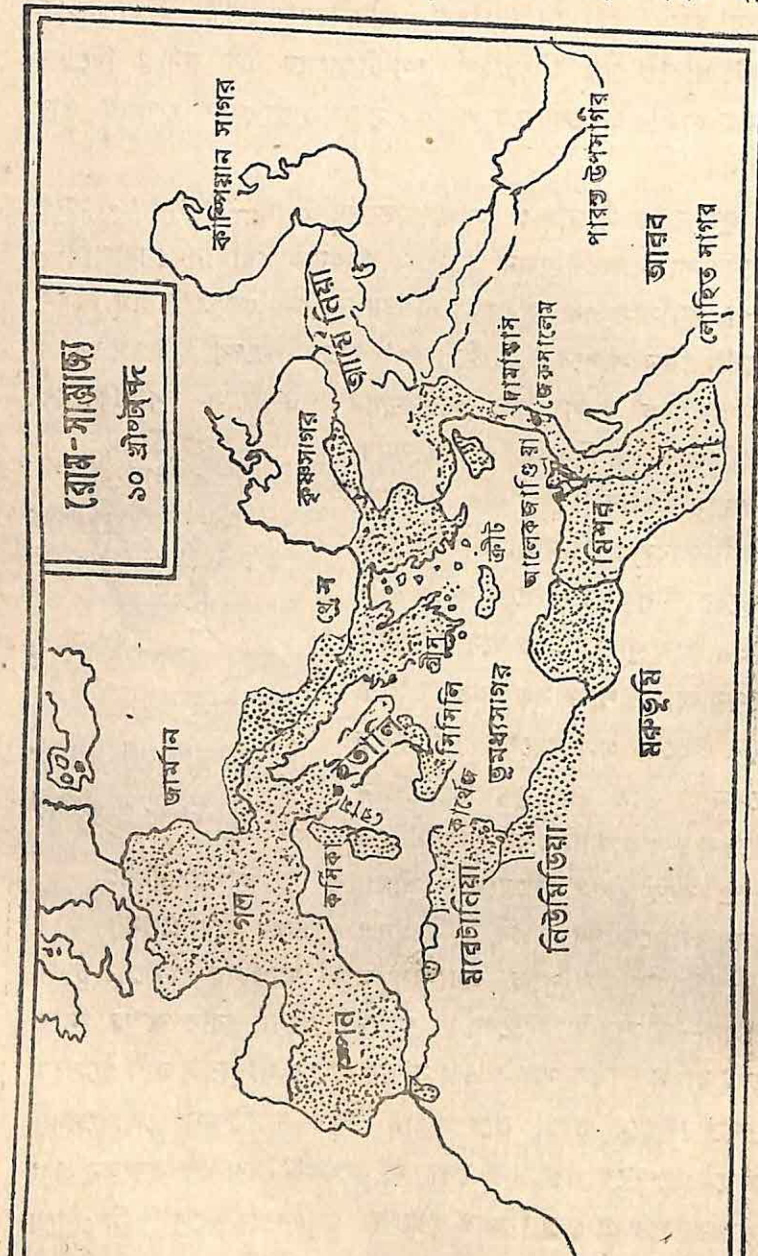
জুলিয়াস সীজার : সাধারণতন্ত্রের শেষ—খ্রীষ্টপূর্ব ৬০ সালে রোমের শাসনভার নিলেন তিনজন বিখ্যাত রোমান সেনাপতি—পম্পে, ক্র্যাসাস এবং জুলিয়াস সীজার। এঁদের একত্রে 'ট্রায়াম্‌ভিরেট' (অর্থাৎ তিন শাসকের গোষ্ঠী) বলা হত। পম্পে ইউরোপের ও এসিয়ার বহু রাজ্য জয় করেছিলেন। ক্র্যাসাস স্পার্টাকাসকে পরাজিত করেই বিখ্যাত হয়েছিলেন। জুলিয়াস সীজার ছিলেন বীর, বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্‌ ও বুদ্ধিমান। তিনি সাধারণ মানুষের উপকারের জন্যে কতকগুলি আইন করে খুব বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। এরপর আরো শক্তি সঞ্চয় করবার জন্যে তিনি উত্তরের গল দেশের শাসনভার নিলেন। সাত বছর যুদ্ধ করে তিনি গলদেশ এবং জার্মানির বহু উপজাতিকে পরাস্ত করে রোম সাম্রাজ্যের সীমা আরো বাড়িয়ে দেন। তিনি ব্রিটেনও আক্রমণ করেছিলেন।


জুলিয়াস সীজার

পার্থিয়ায় এক যুদ্ধে ক্র্যাসাস মারা যাওয়ায় প্রধানের দুজন রইলেন—সীজার আর পম্পে। দুজনের মধ্যে এবার কর্তৃত্ব নিয়ে লড়াই বাধল। কিন্তু সাহস এবং বুদ্ধির জোরে সীজারই জয়ী হলেন। পম্পের পিছনে তাড়া করে তিনি উত্তর আফ্রিকায় পৌঁছলেন। সেখানে পম্পেকে পরাজিত করলেন, কয়েকটি দেশ জয় করলেন এবং মিশরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করলেন। এসবের ফলে তিনি রোমে সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী শাসক হয়ে বসলেন। তিনি যা বলতেন, সেনেট তাই শুনত। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে সাধারণতন্ত্র শেষ হয়ে গেল।

সীজার সেনেটের স্বার্থপর ও অকর্মণ্য সদস্যদের পছন্দ করতেন না।

সেনেটের সদস্যরাও সীজারের কর্তৃত্বের ভাব পছন্দ করত না।



ব্রুটাস এবং ক্যাসিয়াসের নেতৃত্বে কয়েকজন সেনেটসদস্য অবশেষে

সীজারকে হত্যা করল। রোমে প্রচণ্ড গোলমাল শুরু হল এবং সাধারণতন্ত্র সম্পূর্ণ শেষ হয়ে সম্রাটযুগ শুরু হল।

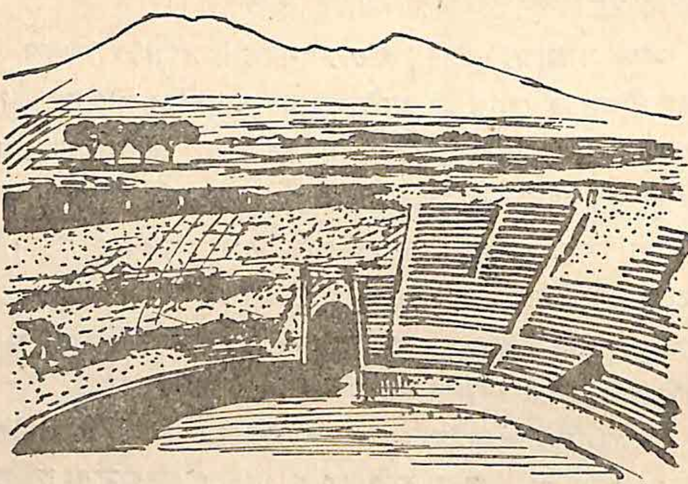
নতুন সাম্রাজ্য—প্রবল প্রতাপে সমস্ত বিরোধীকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে সীজারের পোষ্যপুত্র অক্টেভিয়ান 'অগাস্টাস সীজার' উপাধি নিয়ে রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট হলেন। তাঁর আমলে রোমের সাম্রাজ্য আরো বৃদ্ধি পায় এবং নানা দিকে রোমের উন্নতি হয়। গ্রীকদের সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য ইত্যাদির প্রতি তিনি অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর সময় বহু সাহিত্যিক জন্মেছিলেন, অনেক প্রাসাদ ও মন্দির তৈরি হয়েছিল। গ্রীকদের অনুকরণে রোমানরা দেবরাজ জুপিটার, ব্যবসা-বাণিজ্যের দেবতা মার্কারি ইত্যাদির পূজা করত।

অগাস্টাসের পর সীজার-বংশীয়দের মধ্যে সম্রাট হন যথাক্রমে টাইবেরিয়াস, ক্যালিগুলা, ক্লডিয়াস ও নীরো। এদের মধ্যে ক্লডিয়াস দক্ষিণ-ব্রিটেন জয় করেন। নিষ্ঠুরতার জন্যে কুখ্যাত নীরোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয় এবং তিনি আত্মহত্যা করেন। এরপর সেনাপতি ভেস্‌প্যাসিয়ান এবং তাঁর দুই ছেলে পরপর সম্রাট হন। এই যুগে রোমান স্থপতিরা বহু বিশাল মন্দির, প্রাসাদ, অ্যাম্‌ফিথিয়েটার ইত্যাদি তৈরি করেছিলেন। খোলামেলা জায়গায় বিশাল গোল জায়গা ঘিরে এসব অ্যাম্‌ফিথিয়েটার তৈরি হত। ভিতরে উঁচু থেকে নীচু পর্যন্ত হাজার হাজার দর্শকের বসবার জন্যে থাপ বা 'গ্যালারি' থাকত। মাঝখানের বিশাল গোল জায়গায় পেশাদার যোদ্ধারা মানুষ বা হিংস্র পশুর সঙ্গে লড়াই করত। এ-জাতীয় লড়াই প্রাচীন রোমে আমোদ-প্রমোদ হিসাবে খুব বিখ্যাত ছিল। ভেস্‌প্যাসিয়ানের আমলে রোমের সবচেয়ে বড় অ্যাম্‌ফিথিয়েটার 'কলোসিয়াম' তৈরি হয়। এর পরবর্তী বিখ্যাত সম্রাটদের মধ্যে ছিলেন ট্রাজান, হাড্রিয়ান, অ্যাণ্টোনিনাস, মার্কাস



মার্কারি (রোমান দেবতা)

অরেলিয়াস এবং কন্‌স্ট্যান্টাইন। সম্ভবতঃ ট্রাজানের আমলে রোম সাম্রাজ্যের সীমা সবচেয়ে বিস্তৃত হয়েছিল। অ্যান্টোনিনাস



পম্পিয়াই নামক ছোট শহরের অ্যাম্‌ফিথিয়েটার (৮০ খ্রীষ্টাব্দ)।
এখানে ২০০০০ দর্শক বসতে পারত।

সুশাসন, দয়ামায়া এবং সাম্রাজ্যের উন্নতির জন্যে খ্যাতি লাভ করেন। কন্‌স্ট্যান্টাইনের আমলে রোমে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারিত হয়। তাছাড়া



রোমের সবচেয়ে বড় অ্যাম্‌ফিথিয়েটার "কলোসিয়াম"-এর (৮০ খ্রীষ্টাব্দ) ধ্বংসাবশেষ।
দৈর্ঘ্য ১৮৬ মি., প্রস্থ ১৫৬ মি., উচ্চতা ৪৮ মি. (১৪ তলা বাড়ির সমান)।
অন্ততঃ ৫০,০০০ দর্শক বসতে পারত!

শাসনের সুবিধার জন্যে তিনি বিশাল রোম-সাম্রাজ্যকে 'পূর্ব' ও 'পশ্চিম' দুভাগে ভাগ করেন। পশ্চিম সাম্রাজ্যের রাজধানী হয় রোম,

পূর্ব সাম্রাজ্যের রাজধানী হয় বাইজ্যান্টিয়াম (পরে তাঁর নাম অনুসারে নাম হয় কন্স্ট্যান্টিনোপ্‌ল)। পরে সমগ্র পূর্ব সাম্রাজ্যেরই নাম হয় বাইজ্যান্টিয়াম। তাঁর পরে যাঁরা সম্রাট হয়েছিলেন, তাঁরা খুবই দুর্বল ছিলেন। তাই তাঁদের আমলে বিরাট রোমসাম্রাজ্যের ক্রমাগত ভাঙন ঘটতে লাগল।

সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন—কন্স্ট্যান্টাইনের আগে থেকেই উত্তর দিক থেকে নানা বর্বর জাতি রোমসাম্রাজ্য আক্রমণ করে আসছিল। তবে শক্তিশালী সম্রাটেরা সেসব আক্রমণকে বিধ্বস্ত করবার শক্তি রাখতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে দুর্বল সম্রাটদের আমলে দুভাগে বিভক্ত রোমান সাম্রাজ্য ক্রমেই দুর্বল হতে লাগল। উত্তরদিক থেকে নানা জার্মান বর্বরজাতি এসে আক্রমণ করতে লাগল। এদের মধ্যে ভ্যাণ্ডাল, গথ, ভিসিগথ, ফ্রাংক, লম্বার্ড, অ্যাঙ্গ্‌ল, স্যাক্সন ইত্যাদি উপজাতি খুবই শক্তিশালী ছিল। রোমসাম্রাজ্যের ভিতরেও গরিব কৃষক ও ক্রীতদাসরা শাসকদের উপর অসন্তুষ্ট ছিল—তাই সাম্রাজ্যের ভিতরেও দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল। ভ্যাণ্ডালরা স্পেন ও উত্তর-আফ্রিকা ছিনিয়ে নিল, ফ্রাংকরা গল বা ফ্রান্স দখল করল, অ্যাঙ্গ্‌ল এবং স্যাক্সনরা হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ইংল্যাণ্ড কেড়ে নিল। এর ফলে পশ্চিমের রোমসাম্রাজ্যের অধীনে ইটালি ছাড়া আর কিছুই রইল না। 'পূর্ব রোমসাম্রাজ্য' অবশ্য আরো এগারো-শ বছর টিকে ছিল। এইভাবে বিশাল রোমসাম্রাজ্যের পতন ঘটল।

খ্রীষ্টধর্মের উত্থান—প্রাচীন জুডিয়ার ন্যাজারেথ শহরে যীসাস বা যীশুর ছেলেবেলা কেটেছিল বলে তিনি 'ন্যাজারেথের যীশু' নামে বিখ্যাত। তাঁর জন্মের বছর থেকে খ্রীষ্টাব্দ গোণা হয় বটে, কিন্তু আসলে জুডিয়ার বেথলেহেম শহরে তাঁর জন্ম হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ৪ সালে। তিনি বড় হয়ে নিজেকে 'ঈশ্বরের পুত্র' এবং 'মানুষের উদ্ধারকর্তা' রূপে ঘোষণা করেন। ক্রাইষ্ট বা খ্রীষ্ট শব্দের অর্থ উদ্ধারকর্তা। দরিদ্র জেলে, কৃষক ও ক্রীতদাসদের মধ্যে তিনি তাঁর উপদেশ প্রচার করতেন। এইসব দরিদ্র মানুষ তাঁর কথায় সান্ত্বনা পেত। তারা দলে দলে তাঁর ভক্ত হয়ে উঠল। এতে রোমান শাসকরা ভয় পেলেন।

জেরুজালেমের শাসক যীশুকে প্রাণদণ্ড দিলেন এবং তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে মারা হল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর ভক্তের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে লাগল। তাঁর উপদেশগুলিকে খ্রীষ্টধর্ম এবং সেই ধর্ম যারা মানে, তাদের খ্রীষ্টান বলা হয়।

রোমানরা দেবদেবীর পূজা করত। খ্রীষ্টানরা তাদের ধর্ম নষ্ট করছে, এই অভিযোগে রোমান শাসকরা তিন শতাব্দী ধরে খ্রীষ্টানদের উপর অত্যাচার চালালেন।

কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের প্রসার বেড়েই চলল। কিছু কিছু অভিজাত রোমানরাও খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করলেন। ক্রমে দরিদ্রদের মধ্যে, নানা উপজাতির মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম ছড়িয়ে পড়তে লাগল। জনসাধারণের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব ক্রমে বেড়ে চলেছে দেখে নানা অঞ্চলে রোমান প্রশাসকরা খ্রীষ্টানদের উপর অনর্থক অত্যাচার বন্ধ করবার আদেশ দিলেন। ক্রমে রোমান শাসকরা বুঝতে পারলেন, খ্রীষ্টানরা ধর্মপ্রচার করলে তাঁদের ক্ষতি নেই। তাই তাদের সে-কাজ তাঁরা কালক্রমে মেনে নিলেন। সম্রাট কন্‌স্ট্যান্টাইন নিজে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করায় সমগ্র রোমসাম্রাজ্যে খ্রীষ্টধর্ম ছড়িয়ে পড়ল।

এক নজরে

(১) রোম প্রথমে নগররাষ্ট্ররূপে গড়ে ওঠে। (২) আশপাশের কিছু শহর দখলের পর দীর্ঘকাল যুদ্ধ করে কার্থেজ সাম্রাজ্য অধিকার করে। হানিবল। (৩) রোমের সমাজে প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান। আন্দোলন, সাধারণতন্ত্রপ্রতিষ্ঠা। (৪) পরবর্তী সমাজে রোমান নাগরিক ও ক্রীতদাস। (৫) ক্রীতদাসবিদ্রোহ—সিসিলি (ইউনুস), রোমের গ্র্যাকাস-ভ্রাতৃদ্বয়, স্পার্টাকাস। (৬) জুলিয়াস সীজার, সাধারণতন্ত্রের শেষ। (৭) নতুন সাম্রাজ্য—অগাস্টাস থেকে কন্‌স্ট্যান্টাইন। (৮) অবনতি ও পতন। (৯) খ্রীষ্টধর্মের উত্থান।

অনুশীলনী

নিবন্ধধর্মী ও ছোটউত্তরধর্মী

১। কার্থেজের সঙ্গে রোমের সংঘর্ষের বিবরণ দাও।

২। প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান কারা? তাদের মধ্যে সংঘর্ষের কী ফল হয়েছিল?

৩। রোমানসাম্রাজ্যে এত ক্রীতদাস কি করে এসেছিল? তাদের অবস্থা কেমন ছিল?

লোহাযুগের সমাজ : রোম

খ্রীষ্টপূর্ব	
৩০০	সমগ্র ইটালিতে রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তার কার্থেজের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধ (২৬৪-২৪১) হানিবল—কার্থেজের সঙ্গে ২য় যুদ্ধ (২১৮-২০২)
২০০	কার্থেজের সঙ্গে তৃতীয় যুদ্ধ (১৪৯-১৪৬), কার্থেজ ধ্বংস। ক্রীতদাসবিদ্রোহ—ইউনুস, ক্লেয়ন। —দুই গ্রাক্কাস ভাই।
১০০	স্পার্টাকাসের বিদ্রোহ (৭৩-৭১) জুলিয়াস সীজার (১০০-৪৪)
খ্রীষ্টাব্দ	অগাস্টাস (মৃত্যু-১৪ খ্রীঃ)। নীরো (৫৪-৬৮) ভেসপ্যাসিয়ান (৬৯-৭৯)—কলোসিয়াম
১০০	**খ্রীষ্টধর্মের প্রসার** অ্যান্টোনিনাস্ (১৩৮)
২০০	
৩০০	কনস্ট্যান্টাইন (৩০৬-৩৩৭)। খ্রীষ্টধর্মপ্রসার। নতুন রাজধানী।
৪০০	নানা বর্বরজাতির আক্রমণে দ্রুত অবনতি শুরু

৪। ক্রীতদাসবিদ্রোহের বর্ণনা দাও। স্পার্টাকাসের কথাও লিখবে।
৫। জুলিয়াস সীজার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৬। নতুন সাম্রাজ্যের কয়েকজন সম্রাটের কথা লেখ।
৭। রোমসাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন কিভাবে হল ?
৮। খ্রীষ্টধর্ম কী ? কি করে খ্রীষ্টধর্ম ছড়িয়ে পড়ল ?

নৈর্ব্যক্তিক

১। **শূন্যস্থান পূরণ কর :**—হানিবল ছিলেন — প্রধান সেনাপতি। কার্থেজ — মহাদেশে অবস্থিত ছিল। রোমে শাসনবিভাগের সর্বোচ্চ কর্তা ছিলেন দুজন —। ক্রীতদাসবিদ্রোহের সবচেয়ে বিখ্যাত নেতা ছিলেন —।

২। **এক শব্দে উত্তর দাও :**—প্রাচীন রোমে গরিবদের কী বলা হত ? ক্রীতদাসবিদ্রোহ কোথায় শুরু হয় ? স্পার্টাকাসকে কোন্ সেনাপতি পরাজিত করেন ? যীশু কত সালে জন্মেছিলেন ? কোন্ রোমান সম্রাট প্রথমে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন ?

৩। **শুদ্ধ হলে পাশে ✓, অশুদ্ধ হলে × চিহ্ন দাও :**—ল্যাটিন-অধিবাসীরাই প্যাট্রিসিয়ান ছিল। আন্দোলনের ফলে গরিব প্লেবিয়ানদের অবস্থার উন্নতি হয় নি। ছ হাজার ক্রীতদাসকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। হানিবল ছিলেন নতুন রোমানসাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট। অক্টেভিয়ান এবং অগাস্টাস সীজার একই লোক।

হাতের কাজ

এই বই থেকে ছেপে রোম সাম্রাজ্যের বিস্তারের একটি মানচিত্র আঁক। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রং দাও এবং নাম লেখ।

৪। চীন

শাং রাজবংশ—এসিয়া-মাইনর অঞ্চলে যখন লোহাযুগ পুরো মাত্রায় শুরু হয়ে গেছে, তখন চীনে পুরোমাত্রায় ব্রোঞ্জযুগ চলছে। এই সময় যে শাং রাজবংশ রাজত্ব করতেন, তাঁদের আমলে ধর্মকর্ম, বিলাস, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদির যাবতীয় জিনিস এবং গাড়ির চাকা ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি হত। চীনে লোহাযুগ সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতক থেকে শুরু হয়।

শাং বংশ প্রায় ছশ বছর রাজত্ব করেছিল (খ্রীষ্টপূর্ব ১৭৬৫-১১২২)। এই আমলেই চীনে গমচাষ শুরু হয়। পরে ধানচাষও আরম্ভ হয়। ধানচাষের জন্যে জলসেচের প্রচলন হয়। নিড়ানি আর কাঠের

লাঙ্গল দিয়ে চাষ করা হত। কৃষির উপর নির্ভর করেই সমাজ চলত। শুয়োর পালন করা হত। গোরু-মোষও পালন করা হত—তবে দুধ খাবার জন্যে নয়, মাংস খাবার জন্যে। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা শাসন করতেন সামন্তরা—রাজবংশের শাসন তেমন জোরদার ছিল না। রাজ্যের আয়তনও খুব বড় ছিল না। রাজধানী আনিয়াংকে কেন্দ্র করে চারদিকে দু-তিন শ কিলোমিটার পরিধি পর্যন্ত অঞ্চলে রাজবংশের প্রাধান্য ছিল। রাজাই ছিলেন যুদ্ধনেতা এবং প্রধান পুরোহিত। বয়োজ্যেষ্ঠ সমিতি শাসনের কাজে রাজাকে সাহায্য করত। ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। ছবি-আঁকা লিপি ব্যবহার করা হত।

এই যুগে চীনে তুঁতগাছের চাষ এবং রেশম উৎপাদন শুরু হয়েছিল। রেশম তৈরির রহস্য ফাঁস করলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। অন্যান্য কারিগরি কাজের মধ্যে ছিল কাঠশিল্প (তীর, ধনুক, নৌকো, রথ ইত্যাদি তৈরি), পাথরশিল্প, মাটির পাত্র তৈরি এবং ব্রোঞ্জশিল্প।

শেষের দিকে রাজারা বিলাসী ও অত্যাচারী হয়ে ওঠেন। চারিদিকে প্রজারা এবং সামন্তরা অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। অবশেষে চু উপজাতিদের নেতা শাং বংশের শেষ রাজা চু-শিংকে মেরে ফেলে এই বংশের রাজত্বের অবসান ঘটান।

কনফুসিয়াস—নতুন রাজবংশের নাম 'চু বংশ'। এই বংশ রাজ্যের আয়তন অনেক বাড়িয়ে তোলে এবং সাড়ে তিনশ বছর রাজত্ব করে (১১২২-৭৭১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। সম্ভবতঃ এই বংশের রাজত্বকালের শেষদিকেই চীনে লোহার হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়। এই বংশের শাসনের পর রাজ্য বহুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এবং তারই এক ভাগে এই বংশের রাজত্ব আরো পাঁচশ বছরের উপর চলতে থাকে (খ্রী. পূ. ২৪৬ পর্যন্ত)। এদের আমলে চীনে এক মনীষী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম কনফুসিয়াস



কনফুসিয়াস

(খ্রী. পূ. ৫৫১-৪৭৯)। ইনি খুব পণ্ডিত ও চিন্তাশীল ছিলেন। এঁকে একটি প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। জীবনে কিভাবে চলতে হবে, কেমন ব্যবহার করতে হবে, এসব নিয়ে তিনি বহু উপদেশ দেন। এইসব উপদেশ নিয়ে চীনে 'কন্‌ফুসিয়াসীয় ধর্ম' নামে এক নতুন ধর্ম গড়ে ওঠে। প্রাচীন ধারার প্রতি শ্রদ্ধা, প্রাচীনদের মতো জীবনযাপন এবং নতুন আবিষ্কার বা প্রথার প্রতি অবিশ্বাস— এগুলিই ছিল তাঁর উপদেশগুলির ভিত্তি। চরিত্রগঠন এবং নৈতিক শিক্ষার উপর তিনি খুব জোর দিতেন। ভাগ্যকে স্বীকার করে নিতে হবে, এটাও ছিল তাঁর উপদেশ। তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি উপদেশ হল, (ক) "অন্যের কাছ থেকে যে ব্যবহার পেতে চাও না, সেরকম ব্যবহার অন্যের সঙ্গে কর'না।" (খ) "যদি কেউ তোমাকে আঘাত করে, তাকেও ক্ষমা করবে, তার সঙ্গেও সদয় ব্যবহার করবে।" (গ) "মাঝামাঝি পথে চললেই ধর্মপথে চলা হবে।" (ঘ) সমস্ত বিশৃঙ্খলার মূল হল জনসাধারণের অবাধ্যতা।"

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকেই তাঁর ধর্মমত চীনবাসীদের উপর খুবই প্রভাব বিস্তার করেছিল।

চীনের প্রাচীর—খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতকের শেষদিকে চীনে তিনশ বছর বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহ চলতে থাকে। অবশেষে



চীনের প্রাচীর

এদের মধ্যে চীন নামে এক বংশ প্রবল হয়ে ওঠে। উত্তরের হুন

ইত্যাদি বর্বর জাতির আক্রমণ ঠেকাবার জন্যে এই বংশের রাজা শি-হুয়াংতি খ্রীষ্টপূর্ব ২১৪ সালে এক বিরাট প্রাচীর তৈরি শুরু করান। এই প্রাচীর 'চীনের প্রাচীর' নামে বিশ্ববিখ্যাত। প্রাচীর শেষ হতে কয়েক শতাব্দী লেগেছিল। চীনের উত্তরদিকে চীন ও মঙ্গোলিয়ার সীমান্ত ধরে পূর্বদিকে সমুদ্রের কাছ পর্যন্ত বিস্তৃত এই প্রাচীর প্রায় ২৪০০ কিমি. দীর্ঘ। প্রাচীরটি প্রায় ৮মি. উঁচু এবং এত চওড়া যে, তার উপর দিয়ে ছ'জন অশ্বারোহী স্বচ্ছন্দে পাশাপাশি যেতে পারে। এই প্রাচীরের উপর কিছুটা দূরে দূরে পাহারাঘর আছে। শত্রুরা আসছে কিনা, পাহারাঘর থেকে দেখতে পাওয়া যেত।

চীন বংশের সাম্রাজ্য—চীন বংশ থেকেই দেশের নাম হয়েছিল চীন। শি-হুয়াংতি ছিলেন এই বংশের সবচেয়ে বিখ্যাত ও শক্তিশালী রাজা (খ্রী. পূ. ২৪৬-২১০)। ইনি চীন-বংশের সব শত্রুকে দমন করেন এবং তাদের রাজ্য দখল করে বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তরের মঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার বহু অংশ ইনি অধিকার করেন এবং 'চীন বংশের প্রথম সম্রাট' উপাধি ধারণ করেন। এঁর বিশাল সাম্রাজ্য ৩৬টি বিভাগে বিভক্ত ছিল এবং দেশশাসনের জন্যে বিপুল ব্যবস্থা ছিল। জলসেচের প্রচুর উন্নতি হয়েছিল, অনেক দীর্ঘ রাজপথও তৈরি হয়েছিল। সৈন্যবাহিনীকে ইনি নতুনভাবে গড়ে তোলেন এবং অশ্বারোহী বাহিনীকে সবচেয়ে গুরুত্ব দেন। তিনি সারা সাম্র[illegible] ধরনের বাটখারা ও ওজনের পদ্ধতির প্রচলন করেন ও বর্ণমালাকে অনেকটা সরল করবার ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু শি-হুয়াংতি তাঁর পূর্ববর্তী সম্রাটদের অপদার্থ মনে করতেন। পুরানো সবকিছুর প্রতি ঘৃণা থাকায় তিনি আগের যুগের সব ইতিহাস পুড়িয়ে ফেলার হুকুম দেন। তবে কিছু বই লুকিয়ে ফেলে বাঁচানো হয়। কন্‌ফুসিয়াসের ভক্ত ৪৬০ জন পণ্ডিতকেও তাঁর আদেশে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়। কিছুদিন পর তাঁর মৃত্যু হলে রাজ্যের লোকেরা তাঁর বংশকে আর রাজত্ব করতে দেয়নি।

পরের অবস্থা—এর পর চারশ বছরেরও বেশী কাল ধরে 'হান্‌'

বংশের সম্রাটরা শাসন চালান। তাঁদের আমলে চীন নানা ক্ষেত্রে উন্নতি করেছিল।

এক নজরে (১) শাং রাজবংশের আমলে ব্রোঞ্জযুগ চলছিল। কৃষিনির্ভর ছোট রাজ্য। (২) পরবর্তী চু বংশের আমলে কন্‌ফুসিয়াস; (৩) শি-হুয়াংতির চীনের প্রাচীর (৪) চীন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা শি-হুয়াংতি।

অনুশীলনী

নিবন্ধধর্মী ও ছোটউত্তরধর্মী

১। সংক্ষেপে শাং রাজবংশের আমলের পরিচয় দাও।

২। কনফুসিয়াস ও তাঁর ধর্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩। চীনের প্রাচীর কে. কখন, কেন তৈরি করান? প্রাচীরের বর্ণনা দাও।

৪। চীন দেশের নাম কোথা থেকে এল? চীন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজার কার্যকলাপের বিবরণ দাও। তাঁর মৃত্যুতে এই বংশ শেষ হল কেন?

নৈর্ব্যক্তিক

১। **এক বা দুই শব্দে উত্তর দাও:—**চীনে কোন রাজবংশের আমলে গমচাষ শুরু হয়? কোন্ রাজবংশের আমলে রেশম তৈরি শুরু হয়? চীনের প্রাচীর তৈরি কে শুরু করান? শিং-হুয়াংতি কি কন্‌ফুসিয়াসের ভক্ত ছিলেন? চীনের প্রাচীর কত উঁচু?

২। **যে দুটির মধ্যে মিল, লাইন টেনে যুক্ত কর:—**

কনফুসিয়াস	চীনের প্রাচীর
শি-হুয়াংতি	কনফুসিয়াসীয় ধর্ম
শাং যুগ	রেশম তৈরি শুরু

হাতের কাজ

১। পিসবোর্ড বা অন্য উপাদান দিয়ে চীনের প্রাচীরের একটি নমুনা তৈরি কর।

সময়রেখা (৮)

লোহাযুগের সমাজ ঃ চীন

খ্রীষ্টপূর্ব	
১৮০০	
	শাং বংশের রাজত্ব শুরু (১৭৬৫)। ব্রোঞ্জযুগ চলছে !
১৪০০	
	শাং বংশের রাজত্ব শেষ, চু বংশের রাজত্ব শুরু (১১২২)
১০০০	
	লোহাযুগ শুরু (সম্ভবতঃ)
৬০০	
	কনফুসিয়াস (৫৫১-৪৭৯)
২০০	চীন বংশ—শি-হুয়াংতি (২১০ পর্যন্ত)। চীনের প্রাচীর।

৫। ভারতবর্ষ

আর্যদের আগমন—আর্যদের আদিনিবাস কোথায় তা নিয়ে পণ্ডিতেরা এক মত নন। পাশ্চাত্ত্যের অনেক পণ্ডিতের মতে কৃষ্ণসাগর, কাস্পিয়ান ও আরল সাগরের উত্তর ও কাছাকাছি অঞ্চলই আর্য জাতিদের আদি বাসস্থান। এদের নানা উপজাতি ছিল। তারা ইউরোপ, এসিয়া-মাইনর, ইরান ইত্যাদি নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ইরানের আর্যদের এক যাযাবর উপজাতিই উত্তরপশ্চিম ভারতে প্রবেশ করে। এই আর্যরা দীর্ঘকাল কঠিন যুদ্ধের পর দ্রাবিড় প্রভৃতি অনার্য জাতিকে হারিয়ে সিন্ধুনদী এবং তার উপনদীগুলির উপত্যকা অঞ্চলে সভ্যতা বিস্তার করে। ক্রমে ক্রমে সরস্বতী, সরযূ গঙ্গা ইত্যাদি নদীর উপত্যকা-অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

বেদ—সভ্যতাবিস্তারের পর আর্য ঋষিরা প্রাচীনকালে চারখানি 'বেদ'-গ্রন্থ রচনা করেন—ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ। এগুলির মধ্যে ঋগ্বেদ সবচেয়ে প্রাচীন এবং বড়ো (খ্রী.পূ. ৩২০০ থেকে ১৪০০-র মধ্যে বহু শতাব্দী ধরে রচিত)। বেদ শব্দের অর্থ 'জ্ঞান'। এই চারখানি বেদ জ্ঞানের ভাণ্ডার। আর্যরা ইন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি যেসব দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ ও উপাসনা করত, বেদে সেইসব যজ্ঞের প্রচুর মন্ত্র আছে। ঋগ্বেদের মন্ত্রের সংখ্যা ১০১৭—লাইনসংখ্যা ৭০,০০০। এছাড়া নানা উপদেশ, জ্ঞানের কথা, আর্যদের সমাজ ও রাজনীতি ইত্যদি বহু তথ্য আছে। ঋগ্বেদের স্তোত্রগুলি নিয়ে যে গান করা হত, সেগুলি নিয়ে সামবেদ রচিত। যজ্ঞের ও নানা অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপ যজুর্বেদে বর্ণিত। অথর্ববেদে সৃষ্টিরহস্য, চিকিৎসার মন্ত্র ও ব্যবস্থা ইত্যদি আছে। পরবর্তীকালে বেদ অবলম্বন করে উপনিষদ, আরণ্যক, সূত্র ইত্যাদি নানারকম অতি মূল্যবান্ সাহিত্য রচিত হয়।

প্রাচীন আর্যদের সমাজ

বেদগ্রন্থগুলি থেকে প্রাচীন আর্যদের সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্রব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়।

সমাজব্যবস্থা—সমাজে একবিবাহ ছিল সাধারণ প্রথা। স্ত্রী সম্মান পেত এবং পরিবারের একজন হয়েই বাস করত। স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে ধর্মেকর্মে যুক্ত থাকত। বিবাহকে পবিত্র ও স্থায়ী বন্ধন মনে করা হত, তাই সাধারণতঃ বিধবাদের বিয়ে হত না। বাবার সম্পত্তি ছেলেরা পেত। মেয়ে বাবার একমাত্র সন্তান হলে সম্পত্তি পেত, না হলে নয়। পোষ্যপুত্র নেবার রীতি ছিল।। মেয়েরা সোনা ও রুপোর নানরকম অলঙ্কার পরত। চুল আঁচড়ান ও চুলে তেল দেবার রীতি ছিল। মেয়েরা বিনুনি বাঁধত, পুরুষেরা অনেক সময় বাবরি রাখত। দাড়ি কামানো বা রাখা, দুইই ছিল। দুধ, দই, ঘি, পায়েস, পনির, এবং চাল ও বার্লির ঘি-মাখানো পিঠে ইত্যাদি খাবার খাওয়া হত। পরের দিকে গাভীহত্যা নিষিদ্ধ হয়েছিল।* একমাত্র যজ্ঞে উৎসর্গ-করা ভেড়া ও পাঁঠার মাংসই খাওয়া হত। মদ্যপান নিন্দিত ছিল, তবে 'সোম'রস যজ্ঞে উৎসর্গ করে খাওয়া হত। রথের দৌড়, ঘোড়দৌড়, পাশাখেলা, নাচগান ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদ প্রচলিত ছিল। তবে ঋগ্বেদে পাশাখেলার নিন্দাও করা হয়েছে।

এ-যুগে মানুষেরা গরু চরানো, চাষবাস, শিকার, হস্তশিল্প, ব্যবসা, নৌকো বা জাহাজচালানো ইত্যাদি নানা কাজে নিযুক্ত থাকত। দ্রব্য বা পশুর বিনিময়ে কেনাবেচা চলত। গুণ এবং কাজ অনুযায়ী সমাজ মোটামুটিভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র, এই চার বর্ণে বা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ব্রাহ্মণরা যাগযজ্ঞ, পড়ানো ইত্যাদি কাজ করতেন। ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধবিগ্রহ, দেশরক্ষা ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত থাকতেন। বৈশ্যেরা ব্যবসাবাণিজ্য ও চাষবাস করতেন। শূদ্রেরা এই তিন বর্ণের সেবা করতেন (ধোপা, নাপিত, চিত্রকর, ছুতোর, কামার ইত্যাদি)। তবে শূদ্রের কয়েকটি শ্রেণী অস্পৃশ্য ছিল। কোথাও কোথাও ক্রীতদাস-প্রথা প্রচলিত ছিল।

---

* বলা হয়েছে, গাভী 'অঘ্ন্যা' অর্থাৎ হত্যার অযোগ্য। (ঋগ্বেদ, ৮ম, ১০১)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের ছেলেরা গুরুর আশ্রমে গিয়ে শিক্ষালাভ করত। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তারা কৃষি, নানা হস্তশিল্প, পশুপালন ইত্যাদি শিখত। সাধারণতঃ বারো বছর 'ব্রহ্মচারী' অবস্থায় থেকে ছাত্ররা শিক্ষালাভ করত। তারপর যারা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে চাইত, তারা নানা ঋষির কাছে গিয়ে নানা বিষয় শিখত। এদের বলা হত 'চরক'। পরিষদ' নামে উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রও ছিল। মেয়েদের শিক্ষালাভের নিয়মিত ব্যবস্থা না থাকলেও বাড়িতে শিক্ষালাভে বাধা ছিল না। পরবর্তী কালে (খ্রী.পূ. ১৪০০-৬০০) নানাস্থানে মেয়েদের জন্যে 'চরণ' নামে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ছাত্রীরা 'ছাত্রীশালা' নামক ছাত্রীনিবাসে থাকত। সেকালে যেসব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত, তার মধ্যে ছিল চার বেদগ্রন্থ, ইতিহাস ও পুরাণ, ব্যাকরণ, গণিত, খনিবিদ্যা, তর্কবিদ্যা, ব্যবহারবিধি, ব্রহ্মবিদ্যা, জীব-বিজ্ঞান, যুদ্ধবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, ও চিকিৎসাবিদ্যা। তবে শিক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল ব্রহ্মবিদ্যা বা ঈশ্বরতত্ত্ব।

ধর্ম—বৈদিক আর্যরা 'এক ঈশ্বর'কেই নানা নামে ভক্তি নিবেদন করতেন। বিশ্বজগতের স্রষ্টা ছড়িয়ে আছেন সবকিছুর মধ্যে ; তাই আর্যরা নানা নামের দেবতার উপাসক ছিলেন। যেসব প্রাকৃতিক উপাদান বা শক্তির উপাসনা করা হত, তার মধ্যে ছিলেন পিতা দ্যৌঃ (স্বর্গের অধিপতি), পৃথিবী, বরুণ (আকাশের দেবতা), ইন্দ্র (বজ্র ও বৃষ্টির দেবতা), সূর্য (ইনি সবিতা, মিত্র, পূষণ্ ও বিষ্ণু নামেও পূজিত হতেন), রুদ্র (শিব), মরুৎ (বায়ুপ্রবাহের দেবতা) ইত্যাদি। অগ্নি এবং সোম গৃহদেবতারূপে পূজিত হতেন। এছাড়াও বিশ্বকর্মা, প্রজাপতি (সৃষ্টিকর্তা) ইত্যাদি নানা দেবদেবীর উপাসনাও হত। যজ্ঞ এবং যজ্ঞে নানা জিনিস উৎসর্গ করা উপাসনার অঙ্গ ছিল। তবে সব ধর্মকর্মের প্রধান লক্ষ্য ছিল 'এক ঈশ্বরকে' উপলব্ধি করা।

রাজনৈতিক কাঠামো—ঋগ্বেদের যুগে রাজনৈতিক কাঠামোর পাঁচটি স্তর ছিল : কুল (পরিবার), গ্রাম, বিশ্ (গোষ্ঠী বা ক্ল্যান), জন্ (জাতি) এবং রাষ্ট্র (দেশ)। এই পাঁচটিরই ভিন্ন ভিন্ন শাসক

ছিল। গৃহের কর্তা ছিলেন 'কুলপ' ; গ্রামের শাসক 'গ্রামণী' ; বিশ্-এর শাসক 'বিশ্‌পতি' ; জাতির নেতা ছিলেন 'গোপ্তা' ; রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসক ছিলেন রাজন্ বা রাজা। সাধারণতঃ রাজার ছেলেই রাজা হতেন। তবে প্রয়োজন হলে রাজা নির্বাচন করা হত। রাজাকে প্রজারা কর দিত। রাজা যুদ্ধ পরিচালনা করতেন ও প্রধানবিচারক ছিলেন। রাজাকে সাহায্য করবার জন্যে নানা মন্ত্রী থাকত। মন্ত্রীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন 'পুরোহিত' অর্থাৎ রাজার গুরু। "সেনানী" অর্থাৎ প্রধান-সেনাপতি ছিলেন আর এক মন্ত্রী। সম্ভবতঃ 'গ্রামণী'ও মন্ত্রী থাকতেন। গোষ্ঠী, গ্রাম ও কুল থেকে যুদ্ধের জন্যে সৈন্য যোগাড় হত। তবে রাজা স্বেচ্ছাচার অর্থাৎ যা-খুশী করতে পারতেন না। বয়োজ্যেষ্ঠদের নিয়ে গঠিত 'সভা' এবং জনসাধারণের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত 'সমিতি' নামে দুটি পরিষদের পরামর্শ, মতামত এবং সমর্থন নিয়ে রাজাকে চলতে হত। গ্রেপ্তার করবার জন্যে 'উগ্র' নামে কর্মচারী ছিল। শাস্তি হিসাবে জরিমানা এবং তাড়িয়ে দেওয়া এসবও প্রচলিত ছিল। সৈন্যবাহিনীতে পদাতিক, রথী এবং অশ্বারোহী নানারকম সৈন্য থাকত। তারা তামা এবং লোহার অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করত।

পরের দিকে অনেক শক্তিশালী রাজা দুর্বল রাজাদের পরাজিত করে রাজ্যের সীমা বাড়িয়ে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। এদের বলা হত সম্রাট্, রাজাধিরাজ বা একরাট্।

দুটি মহাকাব্য—বৈদিক যুগের অর্থাৎ বেদের যুগের শেষদিকে **রামায়ণ ও মহাভারত** নামে দুখানি মহাকাব্য রচিত হয়। আর্য কবিরা কি অসাধারণ কাব্যসাহিত্য রচনা করতে পারতেন, এই মহাকাব্য দুটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বহু আগে থেকে লোকমুখে প্রচলিত নানা কাহিনী নিয়ে পরবর্তীযুগে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন এবং বেদব্যাস মহাভারত রচনা করেন, এটাই পণ্ডিতদের মত।

সাহিত্যে সর্বদাই যুগের ও সমাজের পরিচয় পাওয়া যায়। রামায়ণ-মহাভারতেও বৈদিক যুগের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। সে-যুগের পরিবার, গ্রাম, সমাজ, রাজ্য, রাজা, যুদ্ধ, অস্ত্র, শিক্ষা-ব্যবস্থা, ব্যবসাবাণিজ্য সব কিছুরই পরিচয় মহাকাব্য দুটিতে আছে।

ইতিহাসের উপাদানরূপে এগুলির মূল্য যথেষ্ট। তাছাড়া, ছাত্রের প্রতি গুরুর স্নেহ, গুরুর প্রতি শিষ্যের ভক্তি, পরিবারে বাবা, মা, দাদা, ভাই-বোন, স্ত্রী, ভৃত্য এদের কেমন সম্পর্ক ছিল, তার এক আদর্শ ছবি এই দুই মহাকাব্যে প্রকাশিত হয়েছে। ঐ সব আদর্শই পরবর্তীকালে ভারতীয়দের প্রভাবিত করেছে।

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান—বেদ ও উপনিষদ্‌গুলি প্রকৃত জ্ঞান অর্জন এবং ব্রহ্ম ও আত্মাকে উপলব্ধি করবার আদর্শ প্রচার করেছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষ সেসব কথা বুঝতে না পেরে শুধু যজ্ঞ, পূজা, পশুবলি এসব নিয়েই মেতে থাকত। জাতিভেদ উগ্র হয়ে উঠেছিল। তাই প্রকৃত সত্যকে প্রচার করবার জন্যে বৈদিক যুগের শেষদিকে নতুন নতুন ধর্মপ্রচারকের আবির্ভাব হয়েছিল। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ। মহাবীরের প্রচারিত ধর্মমতের নাম জৈনধর্ম। গৌতম বুদ্ধের ধর্মমত 'বৌদ্ধধর্ম' নামে বিখ্যাত।



মহাবীর

জৈনধর্ম—কথিত আছে, মহাবীরের আগে আরো তেইশজন 'তীর্থংকর' জৈনধর্মের মতগুলি প্রচার করতে থাকেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত পার্শ্বনাথ। মহাবীর ছিলেন চব্বিশসংখ্যক বা শেষ 'তীর্থংকর'। উত্তর বিহারের এক ছোট রাজ্যের রাজপুত্র মহাবীর খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম বা ষষ্ঠ শতকে জন্মগ্রহণ করেন। কিছুদিন পর তিনি সংসার ত্যাগ করে বহু বছর কঠোর তপস্যা দ্বারা পরমজ্ঞান লাভ করেন। কামনা, মোহ, লোভ এসব ত্যাগ করেন বলে 'জিন' (অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়) নামে পরিচিত হন। মহাবীরের প্রচলিত ধর্মমত অনুযায়ী, ভগবান নেই ; মানুষ সৎজ্ঞান, সৎকর্ম এবং সৎব্যবহার এই তিনটি পন্থা অনুসরণ করলে মুক্তি পাবে—বারে বারে পৃথিবীতে জন্মে তাকে দুঃখভোগ করতে

হবে না। জৈনরা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে, কর্মফল মানে। অহিংসা জৈনধর্মের প্রধান ভিত্তি, তাই জৈনধর্মে জাতিভেদ স্বীকার করা হয় না। এই ধর্মের নিয়মকানুনও খুব কঠিন।—সেই কালের উত্তরভারতে বহু মানুষ, বহু রাজা ও ধনী জৈন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম—উত্তর বিহারে কপিলাবস্তু নগরে খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম বা ষষ্ঠ শতকে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ বা গৌতমের জন্ম। কয়েক বছর সংসার করার পর ইনি সংসার ত্যাগ করেন। বহু বছর তপস্যার পর পরমজ্ঞান লাভ করেন এবং 'বুদ্ধ' নামে বিখ্যাত হন। ইনি প্রচার করলেন, অজ্ঞানের ফলেই মায়া জন্মে, মায়ার ফলেই পৃথিবীতে মানুষ কষ্ট পায়। কিন্তু সৎকর্মের দ্বারা আত্মার চরম উন্নতি ঘটাতে পারলে 'নির্বাণ' হয়, অর্থাৎ আত্মা মুক্তিলাভ করে—পুনর্জন্ম হয়ে আর কষ্ট পায় না। যাগযজ্ঞ, জাতিভেদ ইত্যাদি নিন্দনীয়। চিন্তা, কর্ম, বাক্য, দৃষ্টি, শ্রম, মনোভাব, ব্যবহার, জীবন এবং আদর্শ—এই আটটি ক্ষেত্রে সৎ হতে হবে। তাছাড়া, অহিংসা, সত্যবাদিতা, ব্রহ্মচর্য, চুরি না-করা, ঐশ্বর্য ত্যাগ, পরনিন্দা না করা এবং পশুবলি না-দেওয়া—এসব নীতিও তিনি পালন করতে বলতেন। —উত্তরভারতে বহু রাজা, ধনী ও সাধারণ লোক তাঁর সংস্পর্শে এসে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।



গৌতম বুদ্ধ

সাম্রাজ্য

মৌর্য বংশ—খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বুদ্ধ যখন তাঁর ধর্মমত প্রচার করে চলেছেন, সে-সময় উত্তরভারতে ষোলটি রাজ্য শক্তিশালী হয়ে

ওঠে। তার দু-এক শ বছর পর এগুলির মধ্যেও মগধ সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মগধের রাজা মহাপদ্ম নন্দ সাম্রাজ্যকে বিশাল করে তোলেন।

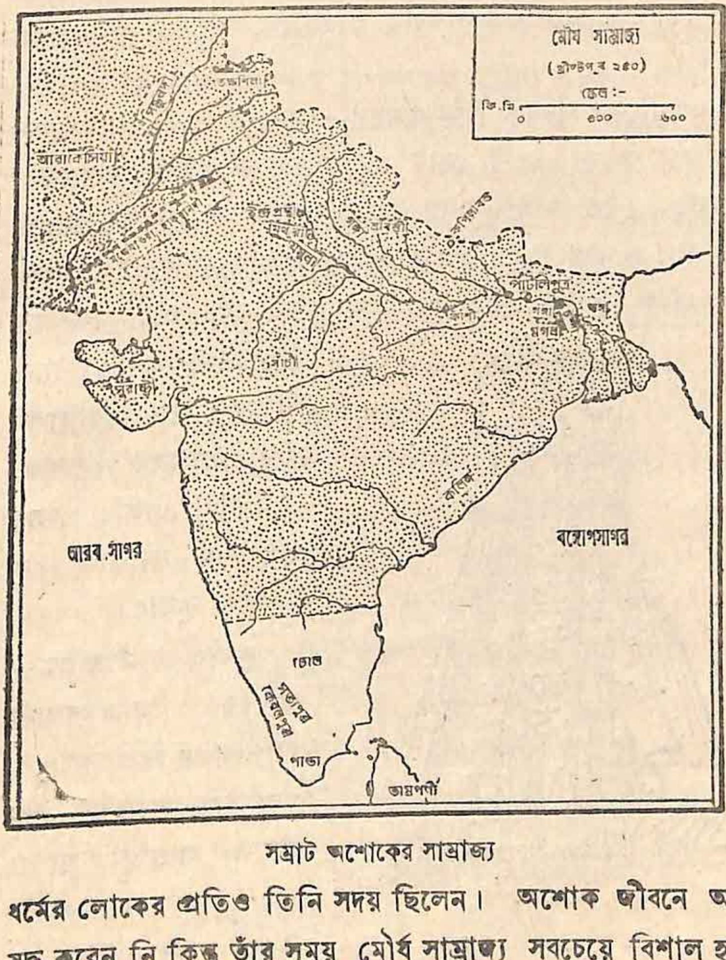
অ্যালেকজ্যাণ্ডার ভারত থেকে যাবার পরই চন্দ্রগুপ্ত নামে মৌর্য বংশীয় এক বীর মহাপদ্ম নন্দের বংশধরকে সরিয়ে মগধ সাম্রাজ্য অধিকার করেন (আনুমানিক ৩২০ খ্রী. পূ.)। তারপর তিনি পাঞ্জাব দখল করলেন। গ্রীক রাজা সেলুকাস পাঞ্জাব উদ্ধার করতে এলে চন্দ্রগুপ্ত তাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং সেলুকাসের রাজ্যের অনেকখানি অধিকার করেন। পশ্চিমে গুজরাট এবং দক্ষিণ ভারতের নানা রাজ্য অধিকার করে তিনি তাঁর সাম্রাজ্যকে সুবিশাল করে তোলেন। শোনা যায়, চাণক্য বা কৌটিল্য নামে এক বিচক্ষণ পণ্ডিত তাঁর মন্ত্রী ছিলেন এবং চন্দ্রগুপ্ত তাঁর রাজ্যে যে সুশাসন চালিয়ে ছিলেন, তাতে তিনি চাণক্যের যথেষ্ট সাহায্য ও পরামর্শ পেয়েছিলেন। আনুমানিক ৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে বিন্দুসার আনুমানিক ১৭৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত শান্তিতে রাজত্ব করেন।



সম্রাট অশোক

বিন্দুসারের পর মৌর্যবংশের সবচেয়ে বিখ্যাত রাজা অশোক সিংহাসনে বসেন এবং ২৩৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কয়েক

বছর পর তিনি কলিঙ্গ জয় করেন। এই যুদ্ধে প্রচুর সৈন্যের প্রাণ-হানি দেখে তাঁর খুব দুঃখ হয়। তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্তের কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন এবং বৌদ্ধধর্মের আদর্শ অনুসারে সাম্রাজ্য শাসন করতে থাকেন। প্রজাদের কল্যাণের জন্যে তিনি অনেক দীর্ঘ রাজপথ তৈরি করিয়ে সেগুলির ধারে ধারে সরাইখানা এবং বড় গাছ বসাবার ব্যবস্থা করেছিলেন, এবং বিচারব্যবস্থার উন্নতি, মানুষ ও পশুর জন্যে চিকিৎসালয় স্থাপন ইত্যাদি বহু কাজ করেছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করায় ভারতে বৌদ্ধধর্ম খুব ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু অন্য

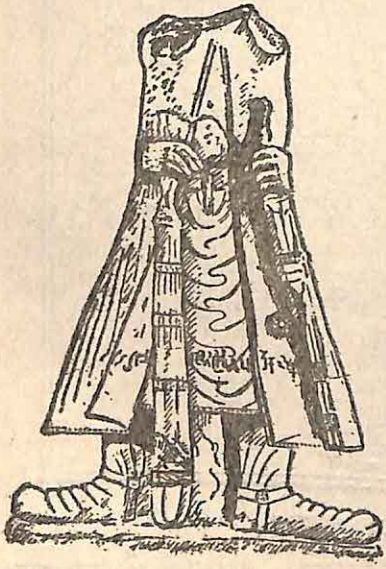


সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্য

ধর্মের লোকের প্রতিও তিনি সদয় ছিলেন। অশোক জীবনে আর যুদ্ধ করেন নি কিন্তু তাঁর সময় মৌর্য সাম্রাজ্য সবচেয়ে বিশাল হয়ে ওঠে। তাঁর সময় শিল্পকলারও খুব উন্নতি হয়। তিনি বলতেন, 'সব

মানুষ আমার সন্তান।' এমন কথা পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো সম্রাটের মুখে শোনা যায় নি। অহিংসা, সত্যবাদিতা, অন্য ধর্মকে শ্রদ্ধা করা, গুরুজনকে শ্রদ্ধা করা, সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করা ইত্যাদি উপদেশ পাথরে খোদাই করিয়ে তিনি সাম্রাজ্যসীমান্তে বহু শিলালিপি ও স্তম্ভলিপি স্থাপন করেন। পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলতেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্যে তিনি নিজের আত্মীয় ও প্রতিনিধিদের বহু বিদেশী রাষ্ট্রে পাঠিয়েছিলেন। এর ফলে পৃথিবীর বহু দেশ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল। সবদিক বিচার করে বলা যায়, অশোকই পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজাপালক সম্রাট।

অশোকের পরবর্তী তিন শ বছর—অশোকের পর মৌর্য সাম্রাজ্য **দুর্বল** হয়ে পড়ে ও ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়। মৌর্যবংশের কয়েকজন দুর্বল রাজা মগধে রাজত্ব করার পর সেখানে পর পর **শুঙ্গ** বংশ ও কাণ্ব বংশের রাজারা রাজত্ব করেন। উড়িষ্যার **চেতবংশ** এবং দক্ষিণ ভারতে সাতবাহন বংশ প্রবল হয়ে ওঠে। এদিকে বাইরের বহু জাতি উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজ্যস্থাপন করে। এর মধ্যে ছিল শক, ব্যাকট্রীয় গ্রীক, পহ্লব এবং শক জাতির এক উপশাখা কুষাণ।


কনিষ্কের ভাঙামূর্তি (মথুরা)

কুষাণ সাম্রাজ্য—বাইরের আক্রমণকারী জাতিগুলির মধ্যে কুষাণরা প্রবল হয়ে ভারতবর্ষে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে। প্রথম দুজন সম্রাট ছিলেন কুজুল কদফিস ও ওয়েমা কদফিস। কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন কনিষ্ক। কনিষ্ক

বোধহয় ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুকাল জানা যায় নি। পুরুষপুরে (পেশোয়ার) তাঁর রাজধানী ছিল। তিনি চীন-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কাশগড়, ইয়ারখন্দ ও খোটান জয় করেন এবং ঐসব অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেন। বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী এই সম্রাট পুরুষপুরে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষের উপর এক বিশাল চৈত্য ও স্তূপ নির্মাণ করান। অন্যান্য ধর্মের প্রতিও তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর আমলে সাম্রাজ্যে বহুদিকে উন্নতি হয়েছিল। তিনি ভারতীয় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, এবং শিল্প ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। বৌদ্ধ মনীষী নাগার্জুন, কবি অশ্বঘোষ, দার্শনিক বসুমিত্র, চিকিৎসাবিদ্ চরক প্রভৃতি তাঁর আমলের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাঁর যুগে গ্রীক, রোমান ও ভারতীয় ভাস্কর্যরীতির মিশ্রণে 'গন্ধার' নামে বিখ্যাত ভাস্কর্যরীতি গড়ে উঠেছিল। মথুরা এবং অমরাবতী ভারতীয় শিল্প ও ভাস্কর্যরীতির জন্যে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। রোম, যবদ্বীপ ইত্যাদি বহু দূরদেশের সঙ্গে এই আমলে ব্যবসাবাণিজ্য চলত।

কনিষ্কের পর আরো কয়েকজন দুর্বল কুষাণ রাজা রাজত্ব করেন। ক্রমে কুষাণ সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে এবং তার অনেকদিন পরে গুপ্ত বংশ বিখ্যাত এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্য—প্রথম চন্দ্রগুপ্তই গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রকৃত



সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা

প্রতিষ্ঠাতা। গুপ্তসাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র (এখনকার পাটনার কাছে)। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের ছেলে **সমুদ্রগুপ্ত** দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন ও বহু যুদ্ধে জয়ী হয়ে গুপ্তসাম্রাজ্যকে বিশাল

করে তোলেন। দক্ষিণ ভারতের বহু রাজ্যও তিনি জয় করেন, কিন্তু সেসব রাজ্য তাঁর বশ্যতা স্বীকার করায় তিনি সেগুলিকে স্বাধীনতা দেন। তিনি কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, এবং শাসনকাজেও অতি দক্ষ ছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের ছেলে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তও যোদ্ধা এবং শাসক রূপে বিখ্যাত ছিলেন। এঁর উপাধি ছিল 'বিক্রমাদিত্য'। সম্ভবতঃ ইনিই গল্প-কাহিনীর সেই প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য এবং মহাকবি কালিদাস



তাঁরই সভাকবি ছিলেন। ইনি পশ্চিম ভারতের শক রাজাদের পরাস্ত করে পশ্চিমভারত থেকে শক শক্তি নির্মূল করেন এবং পশ্চিমভারত তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। উজ্জয়িনীতে ইনি দ্বিতীয়

রাজধানী স্থাপন করেন। চীনদেশের পরিব্রাজক ফা-হিয়েন তাঁর আমলে এদেশে এসেছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর কুমারগুপ্ত এবং তাঁর পরে স্কন্দগুপ্ত সম্রাট হন। এঁরা দুজনেই বেশ শক্তিশালী সম্রাট ও সুদক্ষ শাসক ছিলেন। কিন্তু তারপর থেকে গুপ্ত বংশ দুর্বল হয়ে পড়ে। পরিবারের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি এবং বাইরে থেকে হূণ জাতির অবিরাম আক্রমণে অবশেষে গুপ্তসাম্রাজ্যের পতন ঘটল।

শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্য ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে প্রচুর উন্নতি হওয়ায় ইতিহাসে গুপ্তযুগকে ভারতের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এই সময় বহু সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হয়, হিন্দুধর্মের বিস্তার ও উন্নতি হয়। গুপ্ত রাজারা হিন্দুধর্মের ভক্ত হলেও অন্য সব ধর্মের প্রতিই উদার ছিলেন। অজন্তার গুহাগুলিতে যে স্থাপত্য এবং চিত্রকলার নিদর্শন সারা পৃথিবীর প্রশংসা পেয়েছে, তার অনেকগুলি গুপ্তযুগেরই সৃষ্টি।

প্রাচীন বাংলা—এখন বাঙালীদের দেশ বলতে প্রধানতঃ বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্র এবং ভারতের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিমবঙ্গকে বোঝায়। আজ থেকে কয়েক শ বছর আগে মুসলমান শাসনের সময় বাঙালীদের সমগ্র অঞ্চলকে 'বাংলা' বা 'বাঙ্গালা' নাম দেওয়া হয়। কিন্তু সুপ্রাচীনকালে এই অঞ্চলে বঙ্গ, পুণ্ড্র, রাঢ় বা রাঢ়া (বা সুহ্ম), তাম্রলিপ্তি, সমতট, দণ্ডভুক্তি, বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী, হরিকেল, বঙ্গাল, গৌড় ইত্যাদি নানা রাজ্য ছিল। পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ বা বাইরের রাজাদের অধিকারের ফলে এসব রাজ্যের সীমা ও আয়তন কখনো ছোট হয়েছে, কখনো বড় হয়েছে।

দুঃখের বিষয়, উপযুক্ত ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া যায়নি বলে বাংলার প্রাচীন যুগের সঠিক ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হয়নি। তবে মুদ্রা, তাম্রপট, শিলালিপি এবং নানা গ্রন্থ থেকে সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা গেছে।

আর্যজাতিগুলি থেকে বাঙালীর সৃষ্টি হয় নি। বাংলায় কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল ইত্যাদি যেসব অনগ্রসর উপজাতি,

দেখা যায়, এরা প্রাচীন অষ্ট্রিক জাতি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এরাই এ-দেশের সবচেয়ে প্রাচীন অধিবাসী। তার কিছুকাল পরে নতুন এক জাতি এসে এদেশ অধিকার করে। এই নতুন জাতি কোথা থেকে এসিছিল তা নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। তবে এরা দ্রাবিড় জাতিও নয়। এই নতুন জাতি হল বাঙালীদের পূর্বপুরুষ। অনগ্রসর জাতিগুলি তখনো নব্যপ্রস্তরযুগে ছিল। এই নতুন জাতির লোকেরা ছিল আরও উন্নত। এরা ক্রমে বাংলায় নানা রাজ্য সৃষ্টি করে এবং সভ্যতা গড়ে তোলে। কিন্তু প্রাচীন অনগ্রসর অধিবাসীদের ব্যবহৃত "খোকা, খুকী" ইত্যাদি অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় ঢুকে যায়। তাছাড়া এদের নানা সামাজিক অভ্যাসও বাঙালীরা গ্রহণ করে (যেমন, শাড়ি পরা, সিঁদুর দেওয়া ইত্যাদি।)

রাজ্যগুলির নাম ও সীমা বারে বারে পালটেছে বলে এগুলি ঠিক কোথায় কোথায় অবস্থিত ছিল তা বলা শক্ত। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের কিছুটা বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। বঙ্গের নাম কখনো **হরিকেল** বা **সমতট** হয়েছে; আবার কোনো কোনো সময় হরিকেল ও সমতট বলতে আলাদা রাজ্যকেও বুঝিয়েছে। এক সময় বঙ্গের মধ্যে **বঙ্গাল** ও **চন্দ্রদ্বীপ** নামে রাজ্য ছিল। বর্তমানের বরিশাল জেলার উত্তর অংশই ছিল চন্দ্রদ্বীপ। এখনকার রাঢ় অঞ্চলেই প্রাচীন **রাঢ় বা রাঢ়া** অবস্থিত ছিল। এক সময় রাঢ়ের নাম ছিল **সুহ্ম**। রাঢ়ার দক্ষিণে মেদিনীপুর জেলায় ছিল **তাম্রলিপ্তি** (তমলুকের চারদিকে) ও **দণ্ডভুক্তি** (সম্ভবতঃ মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল)। উত্তরবঙ্গের নাম ছিল **পুণ্ড্রবর্ধন**—তবে অনেক সময় বাংলার অন্যান্য অঞ্চলও পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পুণ্ড্রবর্ধনে গঙ্গা ও করতোয়া নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে **বরেন্দ্র** বা বরেন্দ্রী রাজ্য ছিল। ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত গৌড় ছিল মুর্শিদাবাদের এক ছোট রাজ্য।

ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে জানা যায়, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে (অ্যালেকজ্যাণ্ডারের সময়) বাংলায় **গঙ্গরিডাই** নামে এক পরাক্রান্ত জাতি রাজত্ব করত। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত এদের পরাক্রম ছিল। 'গঙ্গে' ছিল তাদের রাজধানী। 'গঙ্গে' বন্দর থেকে বাংলার

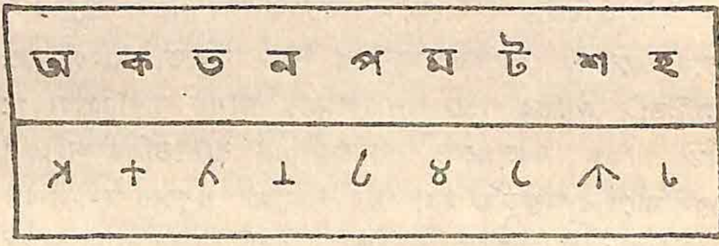
প্রসিদ্ধ মস্‌লিন কাপড় বিদেশে রপ্তানী হত। বোধহয় ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী অঞ্চলে এদের রাজত্ব ছিল। এই রাজত্বই সম্ভবতঃ নন্দবংশের অধীনে বিশাল মগধসাম্রাজ্য স্থাপন করে এবং পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপন করে। সম্ভবতঃ এদের ভয়েই অ্যালেকজ্যাণ্ডারের সেনাবাহিনী বিপাশার পূর্বদিকে অগ্রসর হতে চায় নি। —তবে মৌর্য এবং কুষাণ যুগে বাংলার বহু রাজ্য মৌর্য ও কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে আর্যরা বাংলায় প্রবেশ করতে থাকে। ক্রমে এদেশের লোকেরা আর্যদের উন্নত সভ্যতা গ্রহণ করে। গঙ্গরিডাই জাতির পতনের পর বাংলায় অনেক স্বাধীনরাজ্য গড়ে ওঠে। কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের আমলে এই রাজ্যগুলির অধিকাংশ গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে উত্তরবঙ্গও গুপ্তদের অধীনে যায়। গুপ্তযুগের একটি তাম্রপটে পুণ্ড্রবর্ধনকে একটি 'ভুক্তি' বা বিভাগরূপে বলা হয়েছে। এই ভুক্তি কয়েকটি 'বিষয়' বা জেলায় বিভক্ত ছিল। ৫০৭ অব্দে বৈন্যগুপ্ত সমতটের প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন। পরে বৈন্যগুপ্ত মগধের সম্রাট হয়েছিলেন।

বিদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ—প্রাচীনকাল থেকে স্থলপথে ও জলপথে বিদেশের বহু অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল। আর্য, কুষাণ ইত্যাদি জাতিরা বাইরে থেকেই ভারতে এসেছিল। পরবর্তীকালে গ্রীক, পারসিক ইত্যাদি জাতি ভারতে এসেছে, রাজ্য-বিস্তার করেছে। তাই নানা সূত্রেই বিদেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ঘটেছে। এর ফলে সেইসব বিদেশী জাতির সঙ্গে ভারতের ব্যবসাবাণিজ্য চলত এবং শিক্ষাদীক্ষা, নানা বিদ্যা, শিল্পকলা ইত্যাদিরও আদানপ্রদান চলত। যেমন, কুষাণ যুগে রোমান মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রা তৈরি হত। ভারতীয় জনকল্যাণমূলক কাজ, সাহিত্য, চিকিৎসা-শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদিতে গ্রীক ও রোমান প্রভাব পড়েছিল। আবার গ্রীক ও পারসিক সাহিত্যে, চিকিৎসাশাস্ত্রে, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদিতে ভারতীয় প্রভাব পড়েছিল। বিদেশী প্রভাবে 'গন্ধার' শিল্প গড়ে উঠেছিল। বাংলার গঙ্গে বন্দর থেকে প্রসিদ্ধ মস্‌লিন

কাপড় প্রাচীনকালে মিশর, গ্রীস, এসিয়া-মাইনর এবং মধ্য এসিয়ার নানা দেশে রপ্তানি হত।

সম্রাট অশোকের বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ফলে এবং বৌদ্ধধর্মের প্রতি ও ভারতীয় আদর্শের প্রতি সম্রাট কনিষ্কের সমর্থনের ফলে ভারতীয় শিক্ষা, ধর্ম ও সামাজিক প্রথা ইত্যাদি মধ্য-এসিয়া ও চীনের নানা অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক জায়গায় ভারতীয় উপনিবেশও গড়ে উঠেছিল। মৌর্য ও গুপ্ত যুগে ভারতে যে



ব্রাহ্মীলিপির নিদর্শন

খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মীলিপি লেখাপড়ার কাজে ব্যবহৃত হত, তার বহু নিদর্শন মধ্য-এসিয়ার নানা স্থানে পাওয়া গেছে। মধ্য-এসিয়ার এই অঞ্চলগুলির মধ্যে রয়েছে খোটান, কাশগড়, কুচাই, ইয়ারখন্দ্, তুরফান, নিয়া, দণ্ডন-উইলিক, এন্দেরে ইত্যাদি এবং চীন-সীমান্তে ইউ-মেন-কুয়ান ও তুন হুয়াং ইত্যাদি নানা স্থান। এসব জায়গায় ধ্বংসাবশেষের একজন আবিষ্কর্তা স্যার অরেল স্টাইন মন্তব্য করেছেন যে, ঐসব জায়গায় চলতে চলতে তাঁর মনে হয়েছে, তিনি যেন প্রাচীন ভারতের পাঞ্জাব অঞ্চলের কোনো স্থান দিয়ে চলেছেন। এ-থেকেই বোঝা যায়, এইসব জায়গার উপর ভারতের প্রভাব কতখানি পড়েছিল।

ঐসব দেশ থেকেও নানা জিনিস ভারতে আসত। তবে ভারত তখন খুব উন্নত ছিল; সুতরাং ভারতীয় জিনিসই বেশী যেত। মধ্য-এসিয়ার দেশগুলি ছাড়া রোমসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নানা রাজ্য, চীন ও জাপানের সঙ্গেও ভারতের বাণিজ্য এবং অন্যান্য যোগাযোগ চলত। ভারতীয় মস্‌লিন, রেশমী কাপড়, মসলা, চিনি, নীল ইত্যাদি নানা জিনিস রপ্তানি হত। রোমসাম্রাজ্য থেকে, সোনা, রুপো, চীনামাটির ... কাচের জিনিস ইত্যাদি আসত।

শুধু স্থলপথে নয়, জলপথেও বিদেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ও নানা বিষয়ে লেনদেন চলত। ভারতের অসংখ্য বন্দর থেকে প্রচুর জাহাজ ভারতের জিনিসপত্র নিয়ে সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মালয় ইত্যাদি দেশে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বোর্নিও, আনাম, কাম্বোডিয়া ইত্যাদি দেশে যেত। দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ায় ভারতের বহু উপনিবেশও স্থাপিত হয়েছিল। এর ফলে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম ঐসব দেশে প্রচারিত হয়। ভারতীয় শিল্পকলা এবং সমাজব্যবস্থাও ঐসব দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

বিদেশী পর্যটকদের চোখে ভারত—প্রাচীনকালে বহু বিদেশী পর্যটক ভারতে এসেছিলেন। অনেকে গ্রীক বা অন্য রাজার প্রতিনিধিরূপে নানা সম্রাটের আমলে এদেশে ছিলেন। গ্রীকরাজ সেলুকাসের প্রতিনিধিরূপে মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের আমলে পাটলিপুত্রে ছিলেন। বিন্দুসারের সময় মেগাস্থিনিসের জায়গায় আসেন ডেইমেকস্। মিশরের গ্রীকরাজ টলেমি বিন্দুসারের সভায় পাঠিয়েছিলেন ডায়োনিসাস্‌কে। বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহ করবার জন্যে এবং বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্যে বহু চীনা পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আসেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ফা-হিয়েন।

এঁদের মধ্যে কয়েকজন ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিবরণ লিখে গেছেন। তার মধ্যে **মেগাস্থিনিস ও ফা-হিয়েনের** বিবরণ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

মেগাস্থিনিস তাঁর 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলের শাসনব্যবস্থা ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে খুবই প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন, সম্রাট মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে' এবং তাঁদের সাহায্য নিয়ে রাজ্যশাসন করতেন। সম্রাট গুপ্তচরের মুখে সাম্রাজ্যের সব খবর পেতেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা করতেন। প্রজাদের মঙ্গলই ছিল তাঁর শাসনের মূল লক্ষ্য। পেশা অনুসারে ভারতবাসীরা দার্শনিক, কৃষক, পশুপালক, ব্যবসায়ী, কারিগর, সৈনিক এবং পরিদর্শক-সভাসদ্, এই সাতশ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। মানুষ সরল ও শান্তিপূর্ণ জীবন কাটাত। ভারতবাসীরা পরিশ্রমী, শান্তিপ্রিয়, সরল ও মিতব্যয়ী

ছিল। কৃষি ছিল প্রধান পেশা। প্রচুর লোক ব্যবসাবাণিজ্য করত। ভারতে নানাপ্রকার খনিজ-সম্পদ্ পাওয়া যেত। ৬ লক্ষ পদাতিক, ৩০ হাজার অশ্বারোহী, ৯ হাজার হাতী ও বহু যুদ্ধরথ নিয়ে চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যবাহিনী গঠিত ছিল। ৩০ জনের এক পরিষদ সৈন্যবিভাগ চালাত। রাজধানী পাটলিপুত্রের কাজকর্ম দেখাশোনা করার জন্যেও ৩০ জনের পরিষদ্ ছিল। শোন ও গঙ্গা নদীর মিলনস্থানে পাটলিপুত্র অবস্থিত ছিল। দৈর্ঘ্যে ১৫ কিমি. ও প্রস্থে প্রায় ৩ কিমি. এই নগর গভীর খাল এবং প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। প্রাচীরের মাঝে মাঝে মোট ৬৪টি তোরণ এবং ৫৭০টি গম্বুজ ছিল। সম্রাটের প্রাসাদ পারস্য-সম্রাটের প্রাসাদের চেয়েও শতগুণে সুন্দর ছিল। পাটলিপুত্র ছাড়া তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, পুণ্ড্রনগর ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য শহর।

ফা-হিয়েন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ভারতে এসেছিলেন। তিনি তীর্থ করতে এবং বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি দশ বছর ভারতবর্ষে ছিলেন। এর মধ্যে তিন বছর ছিলেন তাম্রলিপ্তিতে।

ফা-হিয়েন তাঁর বিবরণে সেকালের ভারতবর্ষের প্রচুর প্রশংসা করে গেছেন। গুপ্তসম্রাটেরা এক উদার শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। চুরি, ডাকাতি, গুণ্ডামি প্রায় ছিলই না। অপরাধীদের খুব কম শাস্তি দেওয়া হত। প্রাণদণ্ড দেওয়াই হত না। খুব বেশী অপরাধ করলে জরিমানা হত। কৃষকেরা উৎপাদিত শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ খাজনা হিসাবে দিত। রাজকর্মচারীরা অত্যন্ত কর্মদক্ষ এবং কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। পাটলিপুত্রের অপূর্ব রাজপ্রাসাদ দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, এ প্রাসাদ মানুষের তৈরি নয়। জনসাধারণ সুখে-শান্তিতে বাস করত—রাত্রে ঘরের দরজা-জানালা খুলেই শুত। মানুষ মামলা করবার জন্যে বিচারালয়ে প্রায় যেতই না। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম প্রবল ছিল এবং বহু বৌদ্ধমঠ ছিল। কেউ মদ, মাংস, পেঁয়াজ বা রসুন খেত না। এক ধর্মের লোক অন্য ধর্মকেও শ্রদ্ধা করত। গুপ্তসম্রাটেরা হিন্দুধর্ম মানতেন কিন্তু বৌদ্ধধর্মের অনুরাগীদের প্রতি তাঁরা খুব উদার ছিলেন। তবে, সমাজে জাতিভেদপ্রথা প্রবল ছিল। যাদের নীচু জাতির লোক

বলা হত, তারা অস্পৃশ্য ছিল, অর্থাৎ তাদের কেউ স্পর্শ করত না। জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল। লোকেদের মধ্যে সৎকাজ করবার এবং সৎভাবে চলবার ঝোঁক ছিল। দেশে বহু রাজপথ ছিল এবং সেগুলির ধারে ধারে সরাইখানা ছিল। দরিদ্র মানুষের চিকিৎসার জন্যে দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। পাটলিপুত্রেও তিনি একটি বিরাট দাতব্য চিকিৎসালয় দেখেছিলেন।

প্রাচীন ভারতবর্ষে নানাদিকে উন্নতি—শিল্পকলা ও স্থাপত্য, সাহিত্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান ইত্যাদি নানাক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতবর্ষ যে-রকম উন্নতি করেছিল, তা প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষে গৌরবের বিষয়। সভ্যতার নানা ক্ষেত্রে এই বিপুল উন্নতিই প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে মূল্যবান্ দিক। কেন না, সাধারণ ভারতবাসীরাই এইসব উন্নতির ক্ষেত্রগুলি গড়ে তোলেন—সম্রাট বা রাজারা নন। সম্রাট বা রাজাদের চেয়ে জনসাধারণই এজন্যে হাজারগুণ বেশী প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

শিল্পকলা ও স্থাপত্যের যেসব নিদর্শন এখনো টিকে আছে, তা সারা পৃথিবীর কাছে প্রশংসা পেয়েছে। মৌর্যযুগে শিল্প ও স্থাপত্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। মৌর্যসম্রাটের প্রাসাদের স্থাপত্য অর্থাৎ গঠনপ্রণালী, কারুকার্য এবং সৌন্দর্য দেখে ফা-হিয়েন বলেছেন, এ রকম প্রাসাদ মানুষের সৃষ্টি হতে পারে না! এই প্রাসাদ খুব মূল্যবান্ কাঠে তৈরি ছিল, ভিতরে ইট ব্যবহৃত হয়েছিল। নদী বা সমুদ্রের ধারের বাড়িঘর তখন এভাবেই বাইরে কাঠ ও ভিতরে ইট দিয়ে তৈরি হত—মেগাস্থিনিসের বিবরণে তা পাওয়া যায়। মৌর্যসম্রাটদের, বিশেষতঃ সম্রাট অশোকের উৎসাহে যে অসংখ্য গুহা ও বৌদ্ধস্তূপ তৈরি হয়েছিল, সেগুলির স্থাপত্য এবং সৌন্দর্যও অসাধারণ। গুহাগুলির দেয়াল কাচের মত মসৃণ ছিল। ভাস্কর্যেরও (অর্থাৎ মূর্তিশিল্প, পাথরের উপর খোদাই ও কারুকার্য ইত্যাদি) একই রকম উন্নতি হয়েছিল। পাথরের স্তম্ভ এবং স্তম্ভশীর্ষগুলিতে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে পশুপাখী ইত্যাদির মূর্তি তৈরি এবং নানা কারুকার্য করা হয়েছিল। সারনাথের 'অশোকস্তম্ভের' শীর্ষে যে সিংহমূর্তিগুলি এবং চক্র তৈরি করা হয়েছিল,

তা পৃথিবীবিখ্যাত। পাটলিপুত্র এবং অন্যান্য স্থানে যেসব মূর্তি পাওয়া গেছে, সেগুলিও অতি চমৎকার। এই যুগে ভারতীয় শিল্পকলায় পারসিক এবং গ্রীক শিল্পরীতির প্রভাবও কিছুটা পড়েছিল।

কুষাণযুগে ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে পারসিক, গ্রীক ও রোমান শিল্পরীতির কিছুটা মিশ্রণের ফলে যে অপূর্ব শিল্পরীতি গড়ে উঠেছিল,



পদ্মবনে হাতী (অজন্তা ১নং গুহা—ষষ্ঠ শতক)

তা 'গন্ধার শিল্প' নামে বিখ্যাত। কিন্তু কুষাণ যুগে মথুরা ও



'অপ্সরা'—অজন্তা (গুহা ১৭)



পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব (অজন্তা)

অমরাবতীতে সম্পূর্ণ ভারতীয় রীতির ভাস্কর্যও উন্নত ছিল। মথুরায় কনিষ্কের যে বিরাট মূর্তিটি পাওয়া গেছে, তা ভারতীয় রীতির নিদর্শন।

সাত-আটশ বছর ধরে শিল্পক্ষেত্রে যে উন্নতি হয়েছিল, গুপ্তযুগে

সম্ভবতঃ তার চূড়ান্তরূপ দেখা গিয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে তুর্কী ও আফগান মুসলমানদের আক্রমণে তার অধিকাংশ নিদর্শনই ধ্বংস হয়ে গেছে। তবু অবশিষ্ট যা আছে, তা অসাধারণ। এগুলির মধ্যে রয়েছে কয়েকটি মন্দিরের স্থাপত্য এবং ভারহুত, সাঁচী, মথুরা, সারনাথ ইত্যাদি জায়গায় পাওয়া ভাস্কর্যের নিদর্শন। স্থাপত্য ও চিত্রকলার অসামান্য বিকাশ দেখা যায় অজন্তার গুহাগুলিতে। যেসব গুহা গুপ্তযুগে তৈরি হয়, সেগুলির অতিমসৃণ দেয়ালে আঁকা অপূর্ব রঙীন ছবিগুলি আজো সারা বিশ্বের দর্শককে মুগ্ধ করছে। সে যুগে তৈরী লৌহস্তম্ভ, মুদ্রা, তামার বুদ্ধমূর্তি ইত্যাদি দেখে বোঝা যায়, গুপ্তযুগে ধাতুশিল্পেরও উন্নতি হয়েছিল।

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রাচীন ভারতে প্রচুর উন্নতি হয়েছিল। সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ভাষায় অনেক কাব্য ও সাহিত্য রচিত হয়েছিল। তার মধ্যে শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' নাটকটি খুব প্রাচীন এবং উৎকৃষ্ট। 'পুরাণ' নামে বিখ্যাত গ্রন্থগুলির অধিকাংশই মৌর্য থেকে গুপ্তযুগের মধ্যে রচিত হয়। বিষ্ণুশর্মার রচিত 'হিতোপদেশ', 'পঞ্চতন্ত্র' ইত্যাদি বিখ্যাত গল্পের বই বোধহয় মৌর্যযুগে লেখা। কনিষ্কের যুগের কবি অশ্বঘোষ বহু কাব্য রচনা করেন। কুষাণ যুগের গ্রন্থকারদের মধ্যে নাগসেন, বসুমিত্র, গুণাঢ্য ও আর্যশূর বিখ্যাত। গুপ্তযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কালিদাস। তাঁর রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটক, 'রঘুবংশ', কুমারসম্ভব, মেঘদূত ইত্যাদি কাব্য পৃথিবীবিখ্যাত। এছাড়া, অমর, বিশাখদত্ত, বসুবন্ধু ইত্যাদির নামও উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও উন্নতি দেখা গিয়েছিল। প্রাচীন যুগে বহু বিষয় নিয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। সেগুলিই শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতির প্রমাণ। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' বইখানি সেকালের আদর্শ শাসনব্যবস্থা নিয়ে লেখা। হিন্দুধর্ম নিয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। প্রাচীন হিন্দুদের ছয়প্রকার দর্শন ও সেগুলির ব্যাখ্যা নিয়ে প্রচুর বই লেখা হয়। বৈদিক যুগের ধরনে শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়াও নানাস্থানে শিক্ষাকেন্দ্র ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল।

'তক্ষশিলা' বিদ্যাচর্চার এক প্রধান কেন্দ্র ছিল। ছাত্ররা গুরুগৃহে

পড়াশোনা করত। মেয়েরা অনেকে বাড়িতে পড়ত। অনেকে 'চরণ' নামক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ত এবং ছাত্রীশালায় বাস করত। সংস্কৃত ভাষার চর্চা খুব বেড়ে যায়। পাণিনি, পতঞ্জলি ইত্যাদি মনীষী সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখে প্রসিদ্ধ হন। চাণক্যও তক্ষশিলায় শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। গুপ্তযুগে, যাঁরা নানা বিষয় পড়াতেন তাঁদের 'আচার্য' এবং যাঁরা বিশেষ কোনো বিষয় পড়াতেন তাঁদের 'উপাধ্যায়' বলা হত। ছাত্রদের শিষ্য বা ব্রহ্মচারী বলা হত। সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণকে 'ভট্ট' বলা হত। অনেক জায়গায় ছাত্রদের সেবায় গ্রাম দান করা হত। ফা-হিয়েন এদেশে থাকার সময় অসংখ্য শিক্ষাকেন্দ্র দেখেছিলেন। এগুলির মধ্যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিত এই দুইশ্রেণীর পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই ছিল। সারনাথে উচ্চশিক্ষার জন্যে 'বিহার' বা কলেজ বিখ্যাত ছিল।

মগধের "নালন্দা মহাবিহার" অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় সেকালে শুধু ভারতবর্ষে নয়, সম্ভবতঃ সারা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এই মহাবিহারের অধীনে অনেকগুলি বিহার ছিল। কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, জাপান, চীন, সিংহল, ইত্যাদি স্থান থেকে বহু পণ্ডিত এখানে উচ্চতর শিক্ষার জন্যে আসতেন। একসময় এখানে ৮৫০০ শিক্ষার্থী ও ১৫১০ জন অধ্যাপক ছিলেন বলে জানা যায়। সুবিস্তৃত জমিতে বিশাল অট্টালিকা নিয়ে এই মহাবিহার অবস্থিত ছিল। রীতিমত বিদ্বান্ শিক্ষার্থী ছাড়া এখানে কেউ ভর্তি হতে পারতেন না। এখানে ধর্মশাস্ত্র, ব্যাকরণ, বেদ ইত্যাদি ছাড়াও যোগ, বিজ্ঞান, শিল্প ও কারিগরি, তর্কবিদ্যা, ন্যায়, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি বহু বিষয় পড়ানো হত। বহু গ্রাম ও জমি এই মহাবিহারের নামে দান করা হয়েছিল। প্রধানতঃ সেই সম্পত্তির আয় থেকেই এর খরচ চলত।

বিজ্ঞানচর্চা—প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, রসায়নবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রচুর উন্নতি হয়েছিল। গুপ্তযুগের বরাহমিহির ছিলেন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও আর্যভট্ট ছিলেন বিখ্যাত গণিতবিদ্। কুষাণ-যুগে নাগার্জুন প্রসিদ্ধ রসায়নবিদ্ ছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ে

'চরক-সংহিতা' এবং 'সুশ্রুত-সংহিতা' নামে দুখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচিত হয়। সে-যুগের চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচার জানতেন।

প্রাচীন ভারত এত বিভিন্ন দিকে এত উন্নতি করেছিল যে, বহু গ্রন্থ লিখেও তার বর্ণনা শেষ করা যায় না। তাও দুর্ভাগ্যক্রমে প্রাচীন যুগের অধিকাংশ কীর্তি এবং গ্রন্থ ধ্বংস হয়ে গেছে। যে সামান্য পরিমাণ উপাদান পাওয়া গেছে, তা থেকে প্রাচীন ভারত সম্পর্কে অল্পই জানা গেছে। ভবিষ্যতে আরো উপাদান পাওয়া গেলে হয়ত সে-যুগের বিরাট সভ্যতা সম্পর্কে আরো অনেক কথা জানা যাবে।

তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অসংখ্য সম্রাট বা রাজার চেয়ে অসংখ্য শিল্পী, সাহিত্যিক, পণ্ডিত, দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরাই প্রাচীন ভারতকে অনেক বেশী গৌরবান্বিত করে গেছেন।

এক নজরে (১) অনার্য জাতিদের যুদ্ধে হারিয়ে আর্যরা ভারতে রাজ্যবিস্তার করে। (২) চারখানি 'বেদ'—বেদে আর্যসমাজের পরিচয়। (৩) রামায়ণ ও মহাভারত (৪) জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান (মহাবীর, গৌতম বুদ্ধ, তাঁদের শিক্ষা)। (৫) সাম্রাজ্য :— মৌর্য (চন্দ্রগুপ্ত, অশোক)—কুষাণ (কনিষ্ক)—গুপ্ত (সমুদ্রগুপ্ত, ২য় চন্দ্রগুপ্ত)। (৬) প্রাচীন বাংলা (আদিবাসী—বাঙালী—বিভিন্ন রাজ্য—আর্য—গঙ্গরিডাই —কুষাণ ও গুপ্ত অধিকার)। (৭) মধ্য এসিয়া ও অন্যান্য বিদেশী রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ—সমাজ ও বাণিজ্যের উপর প্রভাব। (৮) মেগাস্থিনিস (মৌর্যযুগে), ফা-হিয়েন (গুপ্ত যুগে) ইত্যাদি। বিদেশী পর্যটকের চোখে প্রাচীন ভারত। (৯) নানা ক্ষেত্রে উন্নতি :—শিল্প ও স্থাপত্য, সাহিত্য, শিক্ষা (তক্ষশিলা, নালন্দা), বিজ্ঞান (জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, রসায়ন, চিকিৎসা ইত্যাদি।)

অনুশীলনী

নিবন্ধধর্মী ও ছোটউত্তরধর্মী

১। আর্যরা কোথা থেকে ভারতে এসেছিল ? তারা এদেশে কিভাবে রাজ্যবিস্তার করল ?

২। 'বেদ' সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

৩। আর্যদের চার বর্ণ কি কি ? কোন্ বর্ণ কি কাজ করত ?

৪। আর্যদের ধর্ম সম্পর্কে পরিচয় দাও। তাদের কয়েকজন দেবতার নাম লেখ।

৫। আর্যযুগের রাজনৈতিক কাঠামোর পরিচয় দাও।

৬। রামায়ণ ও মহাভারত থেকে আর্যযুগ সম্বন্ধে কি কি জানা যায়?

৭। জৈনধর্মের প্রচার কে করেছিলেন? মহাবীরের প্রচারিত কয়েকটি উপদেশ লেখ।

৮। বৌদ্ধধর্মের আসল নীতি ও উপদেশগুলি কি কি?

৯। অশোককে শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা হয় কেন?

১০। কুষাণ কারা? এই বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাটের পরিচয় দাও।

১১। গুপ্তযুগের শ্রেষ্ঠ দুজন রাজা এবং এ-যুগের কীর্তির পরিচয় দাও।

১২। প্রাচীন বাংলায় কারা রাজ্যস্থাপন করেছিল? কয়েকটি রাজ্যের নাম কর।

১৩। গঙ্গরিডাই জাতি সম্পর্কে যা জান লেখ।

১৪। বিদেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ সম্পর্কে বিবরণ দাও।

১৫। ভারত সম্পর্কে মেগাস্থিনিসের বিবরণ সংক্ষেপে লেখ।

১৬। ফা-হিয়েনের দেখা ভারতবর্ষ কেমন ছিল, সংক্ষেপে লেখ।

১৭। প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার পরিচয় দাও।

১৮। প্রাচীন ভারতে সাহিত্যের যে উন্নতি হয়েছিল, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

১৯। প্রাচীন ভারতের তক্ষশিলা ও নালন্দা সম্পর্কে লেখ।

২০। প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চার উন্নতি সম্পর্কে যা জান লেখ।

২১। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :—অজন্তা ; গন্ধারশিল্প ; পাটলিপুত্র ; গঙ্গরিডাই ; বঙ্গাল ; পুণ্ড্রবর্ধন ; ঋগ্বেদ ; অথর্ববেদ ; রামায়ণ ; সারনাথ ; খোটান ; অরেল স্টাইন ; 'চরণ' শিক্ষাকেন্দ্র।

নৈর্ব্যক্তিক

১। **শূন্যস্থান পূরণ কর** :—আর্যেরা প্রথমে — নদীর উপনদীর উপত্যকায় সভ্যতা স্থাপন করে। বেদের মধ্যে —সবচেয়ে বড়। — বর্ণের লোক আর্যযুগে লেখাপড়ার অধিকার পেত না। আর্যরা সূর্যকে — এবং — নামেও উপাসনা করত। বিশ্-এর শাসনকর্তা ছিলেন —। মহাবীরের আগে — জৈনধর্মের এক প্রচারকরূপে বিখ্যাত ছিলেন। সম্রাট — র যুগে গন্ধার শিল্প গড়ে উঠেছিল। — ছিলেন মৌর্যযুগের শ্রেষ্ঠ সম্রাট।

২। **এক বা দুই শব্দে উত্তর দাও** :—অর্থশাস্ত্র কার রচিত? গুপ্তসম্রাটেরা কোন্ ধর্মের অনুরাগী ছিলেন? ফা-হিয়েন কোন্ সম্রাটের সময়ে এসেছিলেন? তাম্রলিপ্তি এখনকার কোন্ জেলায় অবস্থিত ছিল? কনিষ্কের রাজধানী কোথায় ছিল? কালিদাস কোন্ যুগের সাহিত্যিক? মহাভারত কে রচনা করেন?

৩। **শুদ্ধ হলে √, অশুদ্ধ হলে × চিহ্ন দাও ঃ**—চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সমুদ্রগুপ্তের আগের লোক। আর্যরা মাংস খেত না। বুদ্ধদেব সারনাথে জন্মেছিলেন। হরিকেল উত্তরবঙ্গে ছিল। গুপ্তসম্রাটেরা বাংলার বহু রাজ্য দখল করেছিলেন। অষ্ট্রিক জাতির লোকেরা আর্য ছিল না। মথুরা ভারতীয় ভাস্কর্যের এক বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল।

৪। **সময় অনুসারে পরপর সাজিয়ে দাও ঃ**—অশোক, ঋগ্বেদ, ফা-হিয়েন, স্কন্দগুপ্ত, মেগাস্থিনিস।

———

সমন্বয়রেখা (৯)

লোহাযুগের সমাজ : ভারতবর্ষ

খ্রীষ্টপূর্ব	আর্যদের আগমন শুরু (আনুমানিক ৩৫০০ খ্রী. পূ.) ঋগ্বেদ রচনা (আনুমানিক ৩২০০-১৪০০ খ্রী. পূ.) রামায়ণ ও মহাভারত রচনা শুরু
৬০০	মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ (খ্রী. পূ. সপ্তম বা ষষ্ঠ শতাব্দী) উত্তর ভারতে ১৬টি প্রধান রাজ্য ১৬টি রাজ্যের মধ্যে মগধ প্রধান হয়ে উঠল।
৫০০	
৪০০	মগধে নন্দবংশের রাজত্ব চলছে চন্দ্রগুপ্ত—মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠা চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু। বিন্দুসার।
৩০০	অশোক (২৭৩) অশোকের মৃত্যু (২৩৬)
২০০	শুঙ্গ বংশ কাণ্ব বংশ
১০০	কুষাণ বংশ—কুজুল কদফিস
খ্রীষ্টাব্দ	ওয়েমা কদফিস কনিষ্ক
১০০	
২০০	গুপ্তসাম্রাজ্য—প্রথম চন্দ্রগুপ্ত
৩০০	সমুদ্রগুপ্ত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত
৪০০	কুমারগুপ্ত স্কন্দগুপ্ত
৫০০	